# বিবিধ প্রবন্ধ।

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী

প্রণীত।

১৫৮ নং বারাণসী ঘোষের ষ্ট্রীট

সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে

প্রকাশিত।
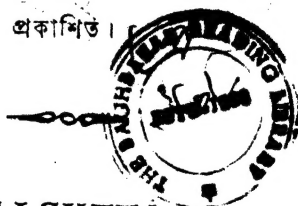
CALCUTTA.

PRINTED BY PITAMBAR BANDYOPADHYAYA,
AT THE ANGLO-SANSKRIT PRESS,
2, NAWABDI OSTAGOR'S LANE,

1891

রেফারেন্স (আকর) গ্রন্থ

# সূচনা।

মানুষের মন বহুকোণী। ভিন্ন দিকে ভিন্ন রঙ্গ প্রতিভাত হয়। প্রবন্ধগুলি অসম্বন্ধ ও বিসম্বাদী প্রতীয়মান হইবে। তবুও একটা পারিবারিক সাদৃশ্য আছে। সেটা স্বাভাবিক, লোকে তাহা পুনরুক্তি বলে, একই সুরে গান, সাঁওতালের পাহাড়ী সুর, কেহ বা বিরক্ত হইবেন, কেহ একটী নিশ্বাস ফেলিবেন, সেইটী লাভ। সহানভূতি কয় জনে পায়? আর যে জন্ম আঁধারে সে আলো দেখাইবে কি?

বিনত

শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরী।

# বিবিধ প্রবন্ধ

## জীবনের উদ্দেশ্য কি ?

আপনার প্রতি, সমাজের প্রতি, দেবতার প্রতি,—মানুষের কর্ত্তব্য সাধারণতঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়। আত্মোৎকর্ষ-বিধান প্রথম শ্রেণীর অন্তর্গত, সামাজিক নিয়ম প্রতিপালন দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত এবং ধ্যান ধারণাদি তৃতীয় শ্রেণীর অন্তর্গত। এই বিভাগ যথেচ্ছাকৃত। আমার কার্য্য দ্বারা যেমন আমার উপকার হয়, আমার কার্য্য দ্বারা যেমন সমাজের উপকার হয়, এই বিভাগের সত্যতা বিশ্বাস করিতে হইলে, আমার কার্য্য দ্বারা তেমনি দেবতাদিগেরও উপকার হয় স্বীকার করিতে হইবে। আবার আমার কার্য্য দ্বারা যেমন আমার এবং সমাজের অপকার হয়, তেমনি দেবতাদিগেরও অপকার হয়। সুতরাং দেবতাগণ মনুষ্যের ন্যায় ইষ্টানিষ্ট প্রভাবিত এবং আমার প্রসাদ-আকাঙ্ক্ষী ও বিরাগ-আশঙ্কী। এইরূপ দুর্ভাগ্য দেবতা পুরাকালের কল্পনা, ইহারা নর-বানর-সমুৎপন্ন।

স্বার্থ, বিবেক ও প্রেম আমাদের সকল প্রকার কার্য্যের উৎস বলিয়া সাধারণতঃ বিবেচিত হয়। স্বার্থপরতা আত্মোৎকর্ষসাধনের প্রস্রবণ, বিবেক সামাজিক জীবনের উৎস এবং দেবকার্য্য প্রেম-সমুৎপন্ন। যখন সকল কার্য্যের নিমিত্ত আমি, তখন আমিই স্বার্থপর রূপে আত্মমঙ্গল অনুষ্ঠান করি, কর্ত্তব্য পরায়ণরূপে তোমাদের উপকার সাধন করি এবং প্রেম-প্রভাবিত হইয়া আপন পর ভুলিয়া "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করো-

মি।" যথেপ্সিত কার্য্য বিভাগে সুতরাং আরো কিছু গোল-যোগ বাঁধে। প্রথম আত্মোৎকর্ষণ এবং যজন যাজন "কর্ত্তব্য" মধ্যে পরিগণিত হয় না। দ্বিতীয়তঃ দেবকার্য্যকে সামাজিক ও আত্মীয় কার্য্য হইতে স্বতন্ত্র করা হয়, তৃতীয়তঃ দেবকার্য্যকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়া সামাজিক কার্য্যকে অবনত করা হয় এবং আত্মোৎ-কর্ষণ অসার, ঘৃণিত ও হীনতম কার্য্য বলিয়া পরিচয় দেওয়া হয়। এই অসদাচরণের ফলে জীবন দুঃখময়, সংসার কণ্টক-পূর্ণ বলিয়া ভারতবর্ষে পরিগণিত হইয়াছে, সন্ন্যাস ও বৈরাগ্য শ্রেষ্ঠতর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে। ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা ও সমাজগত ব্যভিচার প্রভৃতি এই অসদাচরণের লোম-হর্ষণ প্রতিশোধ লইতেছে। আমার দ্বারা দেবতার কোন ইষ্টানিষ্ট হইতে পারে না, তাঁহারা আমার প্রসাদ বা বিরাগ আকাঙ্ক্ষা বা আশঙ্কা করিতে পারেন না। তাঁহারা আমাকে অদৃষ্টপূর্ব্ব পুরস্কার দিয়া কর্ত্তব্যে প্রণোদিত বা দণ্ড দিয়া অকর্ত্তব্যে পরাঙ্মুখ করেন না। আমরা অপ্রত্যক্ষ ভাবে তাঁহাদিগের সহিত সম্পর্কিত। আমাদের যাহা কিছু করিবার আপনার বা সমাজ সম্বন্ধে, দণ্ড পুরস্কার, ভয় ভাবনা, অনুরাগ বিরাগ, এই দুই জনের নিকট। আমাদের কর্ত্তব্য-পালিত না হইলে, এই দুই জনের অন্যতর দণ্ড দেয়, পালিত হইলে অন্যতরের নিকট পুরস্কার পাই। ইহারা দেবতা প্রণোদিত কি না, ইহাদিগের শক্তি সেই শক্তিসঞ্জাত কি না, চিন্তা করিতে দার্শনিকের আনন্দ জন্মিতে পারে; কিন্তু জীবনের প্রাত্যহিক কার্য্যে তাহাদিগের ফলোপধায়কতা প্রত্যক্ষ নহে। সুতরাং দেবতার কোন কার্য্য করিবার জন্য আমাদের জীবন নহে। যদি দেবতার কোন কার্য্য থাকে, দেবতা আপনার কার্য্য

আপনি করিবেন, আমাদের জীবনের উদ্দেশ্য অন্য প্রকার। দেবানুগত প্রবৃত্তির অনুশীলন করা কর্ত্তব্য কি না, সে কথা এখানে আলোচনা করা হইল না।

অগত্যা আমাদিগের কর্ত্তব্য দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া পড়ে—সামাজিক ও স্বকীয়—ইহাদিগের কেহ কাহারও শ্রেষ্ঠ নহে। পরন্তু যাহা আমাদিগের সামাজিক কর্ত্তব্য, তাহা স্বকীয় কর্ত্তব্যের রূপান্তর মাত্র ; বস্তুতঃ স্বকীয় কর্ত্তব্যই একমাত্র কর্ত্তব্য, সামাজিক বা দৈবিক সকল কর্ত্তব্যই স্বকীয় কর্ত্তব্য, কেবল নামভেদ মাত্র। এবং যদি শ্রেষ্ঠতা কাহাকেও দিতে হয়, স্বকীয় বা স্বার্থ-প্রসূত কর্ত্তব্যকেই সে শ্রেষ্ঠতা দিতে হইবে। জীবমাত্র স্বার্থপর, কর্ম্মমাত্র স্বার্থপরতা-প্রসূত। স্বকীয় না হইলে পরকীয় হইতে পারে না। আগে স্বতন্ত্রতা, তাহার পর সমাজ।

জীবনের উদ্দেশ্য স্বার্থসাধন। আমার যাহাতে উন্নতি হয়, আমি তাহাই করি। উন্নতি অনুশীলনে, কর্ম্ম অনুশীলনের নামান্তর। স্বকীয় কার্য্য বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলনহেতু, পরকীয় বা সামাজিক কার্য্য ভাব-বৃত্তির অনুশীলনহেতু এবং বুদ্ধি ও ভাব উভয় বৃত্তির অনুশীলনহেতু দেব-কার্য্য। দেব-কার্য্যে ভাব ও বুদ্ধির সমতা, কেহ কাহারও উপর প্রাধান্য লাভ করিতে পারে না। ভাব ও বুদ্ধির সমতার নাম প্রেম। প্রেমে ভাবের সত্ত্বা নাই, বুদ্ধির প্রভবতা নাই ; প্রেমে হাসি কান্না নাই, বিচার তর্ক নাই, জড়তা নাই, সূক্ষ্মতা নাই, কার্য্য নাই, প্রবণতা নাই।

সামাজিক কার্য্য প্রবণতা-মূলক ও আত্ম-কার্য্য কার্য্য-পরতা মূলক। সামাজিক কার্য্য, কার্য্যতৎপরতা দেখাইবার ক্ষেত্র

বা আত্ম স্বার্থপ্রবণতা দেখাইবার ক্ষেত্র নহে। অথচ যদি সামাজিক ও দেবকার্য্য উঠাইয়া দিয়া সকলই আত্ম-কার্য্যে পরিণত কর, তখন আত্ম-কার্য্যের উদ্দেশ্য বুদ্ধিবৃত্তি ও ভাব-বৃত্তি উভয়ের যুগপৎ ও সমন্বয় কৃত উন্নতি। যখন উভয়ের সমন্বয় হইয়া প্রত্যেকের স্বতন্ত্রতা লোপ হয়, গঙ্গাযমুনার সঙ্গমে কে কোথায় বা কে কি পৃথক্‌ করিবার সামর্থ্য থাকে না, লোকে তাহাকে প্রেম বলে। আত্মোৎকর্ষণের সেই চূড়ান্ত। সুতরাং মানুষের কর্ত্তব্য তিন প্রকার নহে, এক প্রকারমাত্র; এবং সে কর্ত্তব্যের মধ্যে কেহ কাহারও শ্রেষ্ঠ নহে। ভাবের কর্ষণ, বুদ্ধির কর্ষণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে; কর্ম্মযোগ জ্ঞানযোগ অপেক্ষা উন্নত নহে; জ্ঞানযোগও কর্ম্মযোগের উচ্চদেশীয় রূপে গণ্য হইতে পারে না। সন্ন্যাসী গৃহস্থের অপেক্ষা পুণ্য-বান্‌ নহেন, গৃহস্থ সন্ন্যসীকে ঘৃণা করিতে পারেন না। গৃহস্থ-সন্ন্যাসী, কর্ম্মী-জ্ঞানযোগী, ভক্ত রামানন্দ মনুষ্য জীবনের আদর্শ। শাক্য চৈতন্যের শ্রেষ্ঠ নহেন, চৈতন্য সিদ্ধার্থকে উপেক্ষা করিতে পারেন না।

আমরা সামাজিক আদেশ প্রতিপালন করি, সমাজের উপকারের জন্য নহে, আমাদের উপকারের জন্য; সমাজের আদেশ উল্লঙ্ঘন জন্য যে দণ্ড পাই, সে দণ্ডও আমাদের আপন উপকারার্থ। আমাদিগকে ছাড়িয়া সমাজ নাই, এ কথাটী সকল সময় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। আমরা যাহা কিছু করি, তাহা যেমন আমার আপন উন্নতিহেতু, তেমনি দণ্ড পুরস্কার ও আমার আপন উন্নতিহেতু, শাস্তি বা প্রতিশোধ দিবার জন্য নহে। এবং দণ্ড পুরস্কারের বিধান কর্ত্তা একমাত্র সমাজ হই-লেও পুরস্কার ততক্ষণ স্ব-স্বরূপ গ্রহণ করে না, যতক্ষণ আমার

অনুমোদন প্রাপ্ত না হয়। দণ্ড পুরস্কারের স্বার্থকতা আমার অনুমোদন সাপেক্ষ ; যতক্ষণ আমার অনুমতি না পায়, ততক্ষণ তাহা অনুচিত তাড়না মাত্র। আমার ভবিষ্যৎ কার্য্য প্রভাবিত করিতে সমর্থ নহে, সুতরাং নিষ্ফল। অতএব আমা-কর্ত্তৃক বা অন্য কর্ত্তৃক আমা সম্বন্ধে যাহা কিছু ঘটে, তাহাতে আমিই প্রধান। আমার মধ্য দিয়া দেখিলে বুঝা যায়, জগতে যাহা কিছু সব আমার জন্য, আমি প্রধান আর সব অপ্রধান। আমার জন্য সমাজ, সমাজের জন্য আমি নহি ; আমার জন্য দেবতা, দেবতার জন্য আমি নহি।

আমি দেহ চালন করি, বুদ্ধি-বৃত্তির অনুশীলন করি, আমার উন্নতির জন্য ; আমি তোমাকে সম্মান করি, পুত্র কন্যাকে স্নেহ করি, প্রতিভার গৌরব করি, দরিদ্রকে দান করি, পাপীকে দণ্ড দেই, আমার উন্নতির জন্য ; আমি যোগ সাধন করি, আরাধনা উপাসনা করি, প্রেমের মধ্য দিয়া আমাতে সকলি পর্য্যবসিত এবং আমিও আমার তন্ময়ে পরিণত দেখি, মধুরে মধুরে ভুবন মধুময় দেখি, সেও আমার আপন উন্নতির জন্য। জীবনের দুঃখ যন্ত্রণা আমার উন্নতির জন্য ; বন্ধুদ্রোহ, বিশ্বাস ঘাতকতা, বিরহ, ব্যথা, বেদনা, বজ্রাঘাত, আমার উন্নতির জন্য। বৈরাগ্য বা সন্ন্যাস, সংসার বা আসক্তি, ভয় বা ভাবনা, জরা বা মৃত্যু সকলই আমার উপকারের জন্য। পদে পদে স্খলিত হইতেছি, চীৎকার করিয়া ডাকিতেছি, ধর ধর, কেহ ধরে না বাঁচায় না, নিজের সামর্থ্য নাই—অন্যে সাহায্য করে না, ডুবিতেছি অনন্ত নরকে, দণ্ড দিতে সকলে প্রস্তুত, আহা বলিয়া আমার ব্যাধির কারণ আমি কি অপরে দেখিতে কেহ প্রস্তুত নহে, অথচ কপোত প্রতি শ্যেনের ন্যায় বজ্রাঘাত

আমাকে ঐ অনুসরণ করিতেছে দেখিয়া কখন আপনাকে অভি-সন্তপ্ত বলিয়া পাষণ্ডদিগকে গালি দেই বটে, কিন্তু পরক্ষণেই বুঝিতে পারি সেও আমার আপন উন্নতির জন্য। আপাত-বিপদে ত্রাহি ত্রাহি করিয়া ডাকিলে জগদ্দল পাষাণ অলক্ষিত কোমলকরে যখন বুক হইতে তুলিয়া লয়, তখনি আবার-আবার ডাকিয়া বলি এ পাষণ্ডকে কেন স্নেহ দেখাইলে, পাষাণে পেষিত কর, জীবন ঘুচিয়া যাউক। দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কতবার দেখিয়াছি, ভীষকের দৃশ্য-কঠোর হস্তখানি কোমল নবনীতময়।

জীবনের উদ্দেশ্য উন্নতি। পরকাল থাকুক বা না থাকুক কর্ম্মফল যখন অবশ্যম্ভাবী, আমার কর্ম্মে যখন অনন্ত কাল আমার সন্তান সন্ততি প্রভাবিত হইবে, তখন কে অপকর্ম্ম করিবে? সমাজের কঠোর শাসন, সন্তান সন্ততির অনন্ত যাতনা ও অতীত কর্ম্মফল-জনিত পরাধীনতা আমাদিগকে নিয়মিত করে। সুতরাং সর্ব্ব বিষয়ে আমরা জ্ঞান, ভাব প্রেম; বেদ, যজ্ঞ, দান ত্রিকর্ম্মের অনুশীলন করিতে বাধ্য। কেহ বা সন্ন্যাস কেহ বা ব্রহ্মচর্য্য আদর্শ আশ্রম বলিয়া ঘোষণা করেন। যে বিদ্যালয়ে আমাদের অধিকাংশ বৃত্তি অধিকতর রূপে অনুশী-লিত হয়, সে আশ্রম সর্ব্বোৎকৃষ্ট ইহা স্বতঃসিদ্ধ কথা। সন্ন্যাস গ্রহণে বা ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনে সকলবিধ বৃত্তি স্ফুরিত হয় না। সংসারাশ্রম সকল আশ্রমের সার, সকল বিদ্যালয়ের শ্রেষ্ঠ। পরন্তু সংসারী না হইলে কেহ সামাজিকও হইতে পারে না, কেহ প্রেমিকও হইতে পারে না।

দেবভক্ত ও সমাজভক্ত হইতে হইলে যে বৃত্তির স্ফূর্ত্তি চাই, সংসারে তাহার সম্ভাবনা। সমাজের শাসন প্রতিপালন করিতে যে আত্ম-সুখ বলিদান দিতে হয়, স্বাধীনতার সঙ্কোচ

করিতে হয়, সংসারে তাহার সাধন না হইলে কখনই তাহাদের লক্ষ্য করিবার সম্ভাবনা নাই। সুখের নাম বহু দর্শন। দুঃখ হইতে যে পলায়ন করে সে কেবল কাপুরুষ নহে, সে অনভিজ্ঞ ও অপূর্ণ। সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মচারী কেবল অসম্পূর্ণ নহে, তাঁহাদের যাহা আছে, তাহাও দুর্ব্বল। তাহারা মনুষ্যত্বের অনধিকারী। সুখের কোমল শয্যায় মনুষ্যত্ব ঘটে না। সমাজ বৃহতীকৃত সংসার মাত্র। সংসারে যাহা ভোগ করি, সহ্য করি, তাহাই অধিক পরিমাণে সমাজে ঘটে। সুতরাং অল্পে অল্পে সংসারে তাহার শিক্ষা না হইলে সমাজে তিষ্ঠান যায় না।

স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, পিতা, মাতার নিকট প্রতিদিন যে উপদেশ পাই, সমাজেও সেই উপদেশ পাইয়া থাকি ; পরিমাণ ভেদ থাকিতে পারে, প্রকার ভেদ নাই। এজন্য যে সংসারী নহে সে সামাজিক মনুষ্য হইতে পারে না, এবং যাহার সাংসারিক শিক্ষা যত অসম্পূর্ণ সে সমাজের তত অনুপযুক্ত ; যাহার সংসারে যত লোক, তাহার শিক্ষা তত অধিক। যাহার পুত্র কন্যা হয় নাই, সে যেমন সমাজে অপ্রবীণ ; যে পিতা মাতার নিকট সংসারে শিক্ষা পায় নাই, সেও সেইরূপ অসামাজিক বলিয়া গণ্য হয়।

এই জন্যই কুমার কুমারী ও বাল বিধবা সমাজ দরবারে স্থান পাইবার অনুপযুক্ত। যাঁহারা ইহাদিগের জন্য ব্রহ্মচর্য্য বিধান করিতে চাহেন, তাঁহারা মনুষ্যত্বের গৌরব বুঝেন না। তাহাদের আদর্শ অপকৃষ্ট। যদি পূর্ণ মনুষ্য চাও, সংসারে খুঁজিতে হইবে। যদি জীবনের উদ্দেশ্য সফল করিতে চাও, সংসারী হইতে হইবে। যদি দেবতায় ভক্তি থাকে, সমাজে প্রীতি থাকে, সংসারী হইতে কাহাকেও নিবৃত্ত করিও না। যে নিবৃত্ত হয় সেও পাপী ; যে নিবৃত্ত করে, সেও পাপী।

তুমি সংসারী, "সর্ব্বোপকারকমং আশ্রমং তে" যাহাতে সকল ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম প্রতিপালিত হয়, যাহাতে সকল বৃত্তির সম্যক্ অনুশীলন হয়, মনুষ্যত্বের একমাত্র সোপান স্বরূপ, তুমি নিজে সেই আশ্রম অবলম্বন করিয়া অন্যের জন্য নির্জীব ব্রহ্মচর্য্য বিধান কর, এই কি তোমার সহৃদয়তা ? "যথা মাতরমাশ্রিত্য সর্ব্বে জীবন্তি জন্তবঃ। বর্ত্তন্তে গৃহিণস্তাবৎ আশ্রিত্যেতর আশ্রমাঃ" তোমারি আচার্য্য মনুর এই উপদেশ। এই উপদেশ কি বলিয়া অবহেলা করিবে? সংসারাশ্রম নিম্নতম স্তর, বীরভূমি, ধর্ম্মারণ্য, দেবক্ষেত্র। কবিত্ব যদি মনোহারী, ধর্ম্ম যদি সুখপ্রদ, প্রেম যদি লোভনীয়, দেবত্ব যদি বাঞ্ছিত, ব্যাবৃত্তি যদি বিজ্ঞানসিদ্ধ, কর্ষণ যদি উন্নতি-প্রসূ, কাপুরুষতা যদি ঘৃণিত, অসম্পূর্ণতা যদি পরিত্যজ্য হয়, তবে সংসারশ্রম অপরিহার্য্য। স্নেহের উৎস, দয়ার প্রস্রবণ, ভক্তির নিদান, কোমলতা, কবিত্ব, প্রেমের প্রতিমা, বীরত্ব, সাহস, অধ্যবসায়ের আদর্শ এমন আর কোথায় মিলিবে ?

> "সত্যার্জবঞ্চাতিথিপূজনঞ্চ,
> ধর্ম্মস্তথার্থশ্চ রতিঃ স্বদারৈঃ।
> নিষেবিতব্যানি সুখানি লোকে,
> হ্যস্মিন পরে চৈব মতং মমৈতৎ॥
> ভরণং পুত্রদারাণাং বেদানাং ধারণং তথা।
> বসতামাশ্রমং শ্রেষ্ঠং বদন্তি পরমর্ষয়ঃ॥

এবং হি যো ব্রাহ্মণো যজ্ঞশীলো গার্হস্থ্যমধ্যাবসতে যথাবৎ।
গৃহস্থবৃত্তিং প্রবিশোধ্য সম্যক্ স্বর্গে বিশুদ্ধং ফলমাপ্নুতে সঃ॥
পুণ্যং গৃহস্থেন বিচক্ষণেন গৃহে সক্তৈমলং প্রয়াসাৎ।

শান্তিপর্ব্ব।

"বিনাপি তৎকর্ত্তৃনিষেবণেন তীর্থাদিসেবা বহুদুঃখসাধ্যা ॥
গৃহী ধনী ধন্যতরো মতো মে তস্যোপজীবন্তি ধনং হি সর্ব্বে।
চৌর্য্যেণ কশ্চিৎ প্রণয়েন কশ্চিদ্দানেন কশ্চিদ্বলতোঽপি কশ্চিৎ ॥
সন্তোষয়েদ্বেদবিদং দ্বিজং যঃ সন্তোষয়ত্যেষ স সর্ব্বদেবান্।
তদ্বেদবিপ্রে নিবসন্তি দেবা ইতি স্ম সাক্ষাচ্ছ্রুতিরেব ব্যক্তি ॥
স্বধর্ম্মনিষ্ঠা বিদিতাখিলার্থা জিতেন্দ্রিয়াঃ সেবিতসর্ব্বতীর্থাঃ।
পরোপকারব্রতিনো মহান্ত আয়ান্তি সর্ব্বে গৃহিণো গৃহায় ॥
গৃহী গৃহস্থোঽপি তদশ্নুতে ফলং যত্তীর্থসেবারবাপ্যতে জনৈঃ।
তত্তস্য তীর্থং গৃহমেব কীর্ত্তিতং ধনী বদান্যঃ প্রবসেন্ন কশ্চন ॥
অন্তঃস্থিতা মূষকমুখ্যজীবা বহিঃস্থিতা গোমৃগপক্ষিমুখ্যাঃ।
জীবন্তি জীবাঃ সফলোপজীব্যস্তস্মাদ্গৃহী সর্ব্ববরো মতো মে ॥
শরীরমূলং পুরুষার্থসাধনং তচ্চান্নমূলং শ্রুতিতোঽবগম্যতে।
তচ্চান্নমস্মাকমমীষু সংস্থিতং সর্ব্বং ফলং গেহপতিক্রমাশ্রয়ম্ ॥

শঙ্করবিজয়ম্।

---

# জীবন বা স্বপ্ন?

জীবনে ও স্বপ্নে প্রভেদ কি? কেহ বলেন জীবন উজ্জ্বলতর, স্বপ্ন ছায়াময় অস্পষ্ট। কথাটা ঠিক নহে। স্বপ্নে স্বপ্ন তেমনি উজ্জ্বলতর তেমনি জীবন্ত, তেমনি প্রাণভরা,—জীবন যেমন উজ্জ্বল, যেমন জীবন্ত, যেমন প্রাণভরা। স্বপ্ন ও জীবনের তুলনা করিবার সময় স্বপ্ন ফুরাইয়াছে, মৃত, অদৃশ্য, উড়িয়া গিয়াছে, জীবন তখন জীবিত, তখন চোখের সমক্ষে। দিনের বেলায় দিন রাত্রির তুলনা হয় না, রাত্রিকালে রাত্রি দিনের তুলনা হয় না। অতীত বর্ত্তমানের তুলনা অসম্ভব, বর্ত্তমান ভবিষ্যতের তুলনা অসম্ভব, অতীত ভবিষ্যতের তুলনা শূন্যে শূন্যে সমালোচনা। জীবিত ও মৃতের তুলনা যদি সম্ভব হইত, স্বপ্ন ও জীবনের তুলনা করা যাইত। অন্ধ চক্ষুষ্মানকে বুঝে না, অন্ধের হৃদয়ে ছায়ার মধ্যে কত লীলার অভিনয় চক্ষুষ্মান্ বুঝিবে কি? দৃষ্টি সীমাবদ্ধ, অন্ধতা অসীম। ক্ষুদ্র রাজ্যের তৃণ-কণা চক্ষুকে অতিক্রম করিতে পারে, অনন্তে যাহা কিছু মহান শোভন দর্শনীয়, অন্ধের তাহা মুষ্টিমধ্যে। জীবন ও স্বপ্ন দুটিকে যুগপৎ অতিক্রম করিতে পারিলে দুটীর সম্যক সমালোচনা করা যায়। নতুবা জীবনে স্বপ্নের বা স্বপ্নে জীবনের পূর্ণাস্বাদ ঘটে না। পূর্ব্ব জীবনের কথা এ জীবনে একেবারে বিস্মৃত হইয়াছি, অতীতের উজ্জ্বলতা মলিন হইয়া ছায়ায় পরিণত হইয়াছে, তীব্রতা কোমল হইয়াছে, কোমল কোমলতর হইয়াছে। কমলের সে কণ্টকটী ভুলিয়া গিয়াছি, কমল কুমুদে পরিণত হইয়াছে। সে সৌরভের ছায়ামাত্র কল্পনায় ভাসি-তেছে। সে মুখখানি ভাবিয়াছিলাম লৌহ অক্ষরে পাষাণে

অঙ্কিত করিয়াছি, কৈ বর্ত্তমানের ধূলায় একেবারে মুছিয়া না যাউক, অংশতঃ ঢাকা পড়িয়াছে, সোজা রেখা বাঁকা হইয়াছে, বাঁকা রেখা সোজা হইয়াছে, সে তিলটী মুছিয়া গিয়াছে, তেমন মোহন হৃদয় ভরা আর নাই। ধরিতে আকু বাঁকু করি ধরিতে পারি না, চিত্রপটে তুলিকা পরাস্ত হইল, তাহার প্রতিকৃতিও তাহাকে তেমনটী দেখাইতে পারে না। সে মাধুরী, সে মনোমোহন মাধুরী, সাধ্য কি প্রতিকৃতি ধরিবে, হৃদয় ধরিয়া রাখিতে পারে নাই। তাই বিরহে দেখিতে ইচ্ছা হয়, বিয়োগে স্বপ্নের প্রত্যাশা করি, আকাশ পানে চাহি, আকাশ যদি রাখিয়া থাকে। "কি জানি কি ঘুমঘোরে, কি চোখে দেখেছি তোরে।" ঘুমের আবেশে যাহা মোহন, দিব্য, উজ্জ্বল, নিকটে, প্রাণের ভিতরে, ঘুম ভাঙ্গিলে ছায়ার সহিত তাহা ধীরে ধীরে সরিয়া যায়, দিবসের আলোককে ঘৃণা করে, ইন্দ্রিয়ের জড়তা তুচ্ছ করে, হৃদয়ের সূক্ষ্ম কোমলতা তাহার মনোমত. তাহার অনাবৃত বক্ষে ছায়ার শীতলতায় সে নৃত্য করিতে ভাল বাসে। জড়তা, তীব্রতা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে সে অন্তর্হিত হয়। সে একাকী একাকিনীর সহিত রমণ করিতে ভাল বাসে। সহ-চরীকেও হৃদয়ের ভালবাসা দেখাইতে চাহে না, প্রতিবেশী চক্ষু কর্ণ উকি মারিলেই সে ঘোমটা টানিয়া কুলবধূর মত মনে মুখে ভিন্ন হইয়া বসে। তার মনের কথা মুখে ফুটে না, সাধ্য কি চোখের কাছে গল্প শুনিয়া তাহার ভালবাসার গাঢ়তা অনুভব করিতে পারিবে। চোখে যাহা ফুটে না প্রতিকৃতিতে তাহা মিলিবে? মানুষের কি দুরাশা! সুতরাং স্বপ্ন অপেক্ষা জীবন উজ্জ্বলতর বলিয়া একটা খামখেয়ালি রেখা টানা বিজ্ঞানসঙ্গত নহে।

স্বপ্ন অসঙ্গত, জীবনসঙ্গতি সম্পন্ন এ কথাই কি সত্য? চোখের কাছে হাতের উপর ধরি ধরি করি ধরিতে পারিত না! যখন ভাবি ধরিলাম, হাত খুলিয়া দেখি শূন্য-মুষ্টি, হাতের ভিতর কিছুই নাই! নির্দ্দয় হৃদয় কবাটে আবদ্ধ করিলাম বাতাস হইয়া উড়িয়া গেল! সুন্দর বলিয়া বনে, পথে, মরু-প্রান্তরে অনুসরণ করিলাম, নিকটে যাইয়া দেখি কুরূপা রাক্ষসী! জীবনে সত্য কোথায়? মস্তিষ্কে বুদ্ধি কোথায়? হৃদয়ে শোণিত কোথায়? আর ঐ যে সাঁঝের আকাশে পক্ষীর স্বরের মত কি একটা স্বর কানে স্পর্শ করিল, ওটা কি সত্য? ঐ যে ছায়াময়ী দেবতা কল্পনার অতীত, ঐ যে কি যেন কিছু-কথার অতীত, কল্পনার অতীত, কবিতার অতীত, গানের রাগিণী, ফুলের সুষমা, জোছনার ছায়া, সৌরভের প্রাণ, ঐ যে কিছু বুকের ভিতর কেমন করিয়া পশিল? স্বপ্নেও যা ভাবি নাই। এও কি সত্য? ইহাও যদি সত্য হয়, জীবন কি স্বপ্ন অপেক্ষা অল্প অসঙ্গত? জাগন্ত চোখে ঘুমের ঘোর, চন্দ্রিকায় বজ্রপাত, পশ্চিমে সূর্য্যোদয় জীবনে কি ঘটে না? ওথেলোর দেসদিমোনা, রাধিকার আয়ান ঘোষ, দরিদ্রের রত্নলাভ, কৃপণের তুলা দান, কুসুমে কীট, কমলে কণ্টক, চন্দ্রে তাপ, হারে সর্প, অমৃতে গরল, ইহা জীবনের নিত্য ঘটনা। স্বপ্নে অযাচিত রত্ন লাভ, জীবনে অসম্ভব সম্ভাবনা। স্বপ্নে কতবার উঠি, কতবার পড়ি, জীবন চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে। যাহা ধরিতে একান্ত বাসনা স্বপ্নে ধরিতে দৌড়াইলে পদে পদে পা পিছলাইয়া পড়িয়া যাই, এক পাও অগ্রসর হইতে পারি না, জীবনে ধরি ধরি আর ধরা হয় না। মরীচিকার মত উপহাস করিয়া চলিয়া যায়। কত গভীর আশা দীর্ঘ নিশ্বাসে পরিণত হইল, আপনার হইয়া

আপনার হইল না, নবনীত পাষাণ হইল, কুসুম শুকাইল, হিমাচল টলিল, বজ্র ছারখার হইল। স্বপ্ন বা জীবন অধিক সঙ্গত, অধিক অযুক্ত কে? পর আপন হয়, আপনার পর হয়, স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। আলো আঁধার, অসম সমতা—স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। পণ্ডিতের মূর্খতা, মূর্খের পাণ্ডিত্য, দরিদ্রের ধন, ধনবানের দুঃখ, অভাগার ভাগ্য, ভাগ্যবানের সর্ব্বনাশ, দূরের নৈকট্য, নিকটের দূরত্ব—স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। দেবতার গলায় হাতির মুণ্ড। হরিহর, কৃষ্ণ কালী, বামনের চন্দ্রলাভ, চন্দ্রের কলঙ্ক—স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। মানুষ দেবতা হয়, দেবতা পশু হয়, বাহিরের যাহা ভিতরে আসে, ভিতরের যাহা উড়িয়া যায়—স্বপ্নেও যেমন জীবনেও তেমনি। জীবন দীর্ঘ স্বপ্নমাত্র, স্বপ্ন ক্ষুদ্র জীবনমাত্র।

স্বপ্ন নিদ্রাবস্থায় ঘটে। কিন্তু জীবনে জাগিয়া কয় জন? আলনাস্কারের মত সকলেই জাগিয়া জাগিয়া ঘুমাইতেছে, কাচের ঝুড়ি পায়ের কাছে রাখিয়া লক্ষ টাকার স্বপ্ন দেখিতেছে, তেলের কলসী মাথায় করিয়া রাজকুমারীকে বিবাহ করিতেছে। জামাজোড়া পরিয়া যে নিদ্রিত তাহার সঙ্গে যে জাগ্রত তাহার কোন প্রভেদ নাই। সুষুপ্তিকালে স্বপ্ন ঘটে না, না ঘুম না জাগরণ এমনি গোধূলিক্ষণে, এমনি তন্দ্রাবস্থায় লোকে স্বপ্ন দেখে, সকলেরই জীবন এমনি তন্দ্রাগত। এক এক বার ধাক্কা খাইলে জাগিয়া উঠে, আবার চোখ চাহিয়া ঘুমাইয়া পড়ে। সকল অঙ্গ কাহারই খেলে না, সকল বৃত্তির সম্যক অনুশীলন কাহারই ঘটে না। একটী জাগিয়া আছে ত, আর একটী ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। জলে ইট পড়িলে ঢেউ উঠে, এক একবার

বাহিরের কোন আকর্ষণ ঘটিলে, আঘাত মিলিলে জীবন জীবন্ত হয়, নতুবা যে নিদ্রা সেই নিদ্রা। জাগ্রত হইলে স্বপ্ন ঘুচিয়া যায়, জাগ্রত হইলে জীবন আর এমনটী থাকে না। তন্দ্রাবস্থায় যখন একটী ইন্দ্রিয় মুদিত আর একটী জাগিয়া থাকে, তখন লোকে স্বপ্ন দেখে, বাহিরের শব্দে বাহিরের আঘাতে স্বপ্নের উদয় হয়। নতুবা জীবনে বুদ্ধি যেমন খেলে, স্বপ্নেও তেমনি খেলে। জীবনে ভাবের প্রাবল্য যেমন, স্বপ্নেও তেমনি। বরং স্বপ্নে যেমন প্রাণ ভরিয়া কান্দা যায়, দিনের বেলায় লোকের চোখের সামনে তেমন মন খুলিয়া কাঁদিতে পারা যায় না, যেন লজ্জা করে। কাহাকেও দুর্ব্বলতা দেখাইতে কেহ ইচ্ছা করে না, এইটী মানুষের দুর্ব্বলতা। স্বপ্নে মানুষের এই মনুষ্যত্বটুকু ঘুচিয়া যায়। স্বপ্নে কত যন্ত্রণা পাই, কাঁদিতে কাঁদিতে বুক ফাটিয়া যায়; বিপদ এড়াইয়া পলাইতে পারি না। তবু ঘুম ভাঙ্গে না। আর এক জন আসিয়া ধাক্কা মারিয়া না চিয়াইয়া দিলে জাগি না। এ জীবনের অনন্ত তুষানলে সকলে দগ্ধ হইতেছি, তবু জীবন ছাড়িতে পারি না, আর একজন আসিয়া না ভাঙ্গাইয়া দিলে এ মোহ ভাঙ্গে না। স্বপ্নের ন্যায় জীবনে মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পট পরিবর্ত্তন হইতেছে, বালু ঘড়ির বালুর মত সর সর করিয়া সব সরিয়া যাইতেছে, মোহনভোগ অন্তর্হিত হইল, যাহা কিছু অখাদ্য তাহাই মাত্র পড়িয়া রহিল, তবু মোহ ভাঙ্গিতেছে না। কবে সে আসিবে যে এ মোহ ভাঙ্গিয়া দিতে পারিবে? যে জ্ঞানী সেই একমাত্র জাগ্রত। সে স্বপ্নেও জীবনের অতীত। উভয়কেই মায়ার লীলা বলিয়া সে বুঝিয়াছে, সে স্বর্গবাসী।

---

# আর্য্যপ্রকৃতির ক্রমবিকাশ।

প্রাচীন ইরানদেশে প্রাচীন আর্য্যসন্তানের প্রাচীন আর্য্য-বাস। আর্য্যবাসে অবস্থান কালে আর্য্যসন্তান অনার্য্য বর্ব্বর বিভিন্ন জাতির সমসূত্রে সঙ্গে বা সংসর্গে বাস করিতেন। মধ্য-আসিয়ার সকলের যে প্রকৃতি, প্রকৃতি-নিয়ন্তা প্রাকৃতিক অবস্থান সকলের পক্ষে যাহা, তাহারা তাঁহার পক্ষেও সেই-রূপ, অন্য সকলের প্রকৃতি যেরূপ বিবর্ত্তিত হইয়াছিল, আর্য্য সন্তানের প্রকৃতিও সেইরূপ বিবর্ত্তিত হইয়াছিল। আর্য্য-প্রকৃতির বিশেষত্ব ছিল না। শিক্ষা বা সভ্যতা হেতু প্রকৃতি-গত বিবর্ত্তন পরিমাণ অনার্য্যদিগের অপেক্ষা আর্য্যসন্তানের অধিক হইয়া থাকিলেও প্রকারভেদ ছিল না। কায়স্থ ও ব্রাহ্মণে এখন যে বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয়, আর্য্যবাসবাসী অনার্য্য ও আর্য্য সন্তানে সেই বিভিন্নতা তৎকালে পরিলক্ষিত হইত।

আর্য্যবাস পরিহার করিয়া আর্য্যসন্তান আর্য্যাবর্ত্তে প্রবেশ করিলেন। দুর্ভেদ্য গিরিমালা, বিশাল বারিধি তাঁহাকে আবদ্ধ করিল। এমন দুর্লঙ্ঘ্য উন্নত অচলশ্রেণী, বহুপয়ঃ নানাশাখ সাগরান্তগা স্রোতস্বতী, বিশাল কান্তার, ঝটিকাময় মরুভূমি, আতবাতের প্রাবল্য আর্য্যবাসে দেখা যায় নাই। "একা অকেতৎ সরস্বতী নদী নাম শুকিঃ যাতি গিরিভ্যাঃ আসমুদ্রাৎ।" (ঋগ্বেদ সপ্তম মণ্ডল সূঃ ৯৫।১।২)। প্রাকৃতিক পরিবর্ত্তনে প্রকৃতিপরিবর্ত্তন কালসাপেক্ষ। ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি দেশে আর্য্যপ্রকৃতি আর্য্যবাসে আর্য্যপ্রকৃতির ন্যায় উগ্র ও বহি-

মুখী ছিল, সাংসারিক সুখ তাহার উদ্দেশ্য। ব্রহ্মাবর্ত্ত-বাসী আর্য্যসন্তান দিন দিনের মুখাপেক্ষী। শত্রুনাশ, বিজয়লাভ, যাগযজ্ঞ, কৃষিকর্ষণে, আনন্দের সুখবাসরে, সন্তান-সন্ততি কুটুম্ব ও পরিবারের সংসর্গে, উদ্দেশে, তাঁহার দিনপাত হইত। ব্রহ্মাবর্ত্ত ও ব্রহ্মর্ষি বাসী আর্য্যসন্তানের সাংসারিক সুখ জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য, ক্রিয়াকলাপ সেই উদ্দেশ্যের সহকারী। তাঁহার আনন্দময় মনে প্রকৃতি আনন্দময়ী, ঋতু আনন্দময়, নীল নক্ষত্রখচিত আকাশ আনন্দময়। বহির্মুখ সাংসারিক-সুখাভিলাষী প্রকৃতি মৃত্যু, পবাময় দুর্দ্দৈব ঘৃণা করে। তাহাদের হস্ত হইতে উদ্ধার পাইতে সে নানাপ্রকার চেষ্টা করে।

ক্রমে সময় আপন প্রাধান্য স্থাপিত করিল। প্রাকৃতিক মহানুভাবতা আর্য্য প্রকৃতির উগ্রতা, বহির্মুখতা বিনাশ করিয়া গভীরতা, অন্তর্মুখতা সম্পাদন করিল। আনন্দের উজ্জ্বলতা বিষাদের ছায়ায় আবৃত হইল। আনন্দরহোর আনন্দ অভিধান হরিবোল হরিবোলের ভৈরবকঙ্কাল রবে ডুবিয়া গেল, দিনদিনের মুখাপেক্ষী আর্য্যসন্তান দিন মাস অতিক্রম করিয়া অনন্ত ভবিষ্যতের মুখাপেক্ষী হইল। সাংসারিক ঐহিক সুখ শ্মশানে হাস্যের ন্যায় অকিঞ্চিৎকর বা ঘৃণার্হ বলিয়া গণিত হইল। অনন্ত পরকাল তাহার চিন্তনীয় হইয়া উঠিল। যে দৈবদুর্ব্বিপাক মশকদংশনের ন্যায় তত্তৎ পরিহারে প্রবৃত্ত হইত, পীড়া যন্ত্রণা মৃত্যুকে ঘৃণা করিত, তখন সে দৈবদুর্ব্বিপাক অকিঞ্চিৎকর, পীড়া যন্ত্রণা অবশ্যম্ভাবী, মৃত্যু স্পৃহণীয় বলিয়া চিন্তা করিত। দৈব যন্ত্রণার অভাব হইলে কৃত্রিম যন্ত্রণার অনুশীলন করিত।

আর্য্য-সন্তানের প্রকৃতি পরিবর্ত্তনে ভারতবাসী অনার্য্যগণ অসামান্য সাহায্য করিয়াছিল। শস্যশালী উর্ব্বরক্ষেত্র, বিথিকাময়ী নগরী হইতে আর্য্যবলে তাড়িত হইয়া আর্য্যসন্তানের উপেক্ষিত ঘৃণিত বনভূম, গিরিগুহা বা মরুস্থল তাহাদের অবলম্বন হইয়াছিল। হিংস্র শ্বাপদের সংসর্গ আর্য্যসংসর্গের শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রতীত হইয়াছিল। শীত বাত তাড়িত, অনাবৃত প্রান্তর জন-পণ্যময় নগরী অপেক্ষা নিরাপদ বলিয়া প্রতীয়মান হইয়াছিল। অনার্য্যহৃদয়ের পৃষ্ঠাস্থি আর্য্যসন্তান চূর্ণ করিয়া দিয়াছিলেন। দারিদ্র্য দুর্দ্দশা দুর্দ্দৈব যন্ত্রণার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম বিষণ্ণতা, সংসারে অনাসক্তি। আনন্দ আর্য্যসন্তানের, ধনরত্ন আর্য্য-সন্তানের, সম্পদ গৌরব আর্য্যসন্তানের; দারিদ্র, যন্ত্রণা অনার্য্যের, বিপদ বিভ্রম অনার্য্যের, মৃত্যু পীড়া অনার্য্যের, একদিন নহে, নিত্য, একজনের নহে সকলের। আর্য্যগৃহে অনার্য্য গোলাম, অনার্য্যরমণী আর্য্যগৃহিণীর সেবিকা, আর্য্যের আনন্দ কোলাহলে অনার্য্যরমণী স্বাপক্ষতা করিবার অধিকারিণী নহে। আনন্দ যজ্ঞের ত্রিসীমায় তাহাদের অঙ্গুলীস্পর্শ অবমাননা বা পদাঘাতের কারণ। সুবর্ণ অলঙ্কার সুবেশ সুপ্রাসাদ আর্য্যরমণীর, অনার্য্যরমণী কুটীরবাসিনী, অন্নমুষ্টি হেতু সারমেয়বৎ প্রভুপত্নীর প্রসাদ ভিখারিণী। দারিদ্র্যের পল্বলের ন্যায় বিষাদের আকর আর কোথায়! লৌকিকতার উপেক্ষা-সংসারে বীতস্পৃহা, কবরের শান্তি এ মরুময় জীবনের একমাত্র কামনা। আর্য-সন্তানের পাদপীড়নে অনার্য্যের গৃহে বিষাদের উৎপত্তি, ক্রমে প্রাবৃট্‌ কালের মেঘের ন্যায় মুসলধারায় আর্য্যগৃহে বর্ষিত হইয়াছিল। জর্দ্দল পাষাণের ন্যায় ভারতবর্ষীয় বিশালপ্রকৃতি আর্য্য-

পুরুষের বক্ষদেশ নিষ্পেষিত করিল, অনার্য্যগৃহ-সঞ্জাত বিষণ্ণতা তাহার পৃষ্ঠাস্থি জীর্ণ করিয়া দিল। আর্য্যপ্রকৃতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্ত্তিত হইল। অনার্য্যেরা প্রতিহিংসা সাধন করিল।

কাব্য দর্শন চিন্তা মহত্ত্বের আকর বিষাদ। বিলাসের কোমল শয্যায় কেহ কখন মহত্ত্ব সঞ্চয় করে নাই। যে ফুলে ফুলে মধু খাইয়া পাখা দোলাইয়া নাচিয়া নাচিয়া উড়িয়া বেড়ায়, সে প্রজাপতি বালক ও যুবতীর মনোরঞ্জন হইতে পারে, কিন্তু একটী মুহূর্ত্ত অতিক্রম করিবার তাহার সাধ্য নাই। একটী অনন্তস্পর্শী সঙ্গীত তাহার কণ্ঠে স্ফুরে না। যাহাতে স্থায়িত্ব আছে, দৃঢ়তা আছে, মহত্ত্ব আছে, তাহাতে তাহা নাই। সূর্য্যের প্রখর জ্যোতিঃও দৃষ্টি সঙ্কুচিত করে, যাহা দূরে, যাহা অনন্তের ক্রোড়ে ভবিষ্যতের জঠরে তাহা দেখিতে দেয় না। ছায়াময় চন্দ্রালোকে দূরে দূরে অতিদূরে দেখা যায়, অতি ক্ষুদ্র পদার্থ বৃহত্তররূপে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সুখ জরোচিত চাঞ্চল্যের কারণ, বিষাদ প্রাণতা উৎপাদনে সমর্থ। দুঃখ দারিদ্র্যে যখন পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণ করিয়া দেয়, তখন লোক গৃহ হইতে বাহির হয়, বর্ত্তমান ছাড়িয়া অতীত ও ভবিষ্যতের অনুসরণ করে। অণু ছাড়িয়া বিশালতা সাপটিয়া ধরে, মুহূর্ত্ত ছাড়িয়া অনন্তত্বে ডুব দেয়। বিষাদের পর্ণকুটীরে রামায়ণ ও মহাভারত, দর্শন ও উপনিষদের উৎপত্তি। ফ্লরেন্স নগরে কত দান্তে মাজিষ্ট্রেট হইয়াছে, কিন্তু বিষাদের নির্ব্বাসন ভিন্ন কে কবে, "ডিভাইনা কমেডিয়া" উৎপাদন করিয়াছে? সুখের আলবালে সঞ্চিত বারিকণা অমৃতত্বের কারণ নহে। বিষাদের অজস্র প্রস্রবণ নিয়ত জীবন্ত স্রোত উদ্গার করিতেছে। যদি কারাগৃহের কঠোরতায় তাঁহার বহির্মুখতা শাসিত

না হইত, কে কবে মিরাবোর নামমাত্র শুনিতে পাইত? অন্ধ হইয়াই জন্ মিল্টন "পারাডাইস লষ্ট" সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অথর্ব্ববেদ ও উপনিষদের সৃষ্টিকারী বিষাদ-কাতর ভারতের আর্য্য ও অনার্য্য সন্তান। অঙ্গুলীভারকাতর কুসুমহার বিলাসিনীর কণ্ঠে শোভা পায়। আনন্দ বাসর বিনা প্রীতির ঠুংরী কোথায় শুনিবে? যদি ভৈরোর রসাস্বাদনে বাসনা থাকে, প্রান্তরে পান্থনিবাসে তরুতলে বিনা তোমার সাধ মিটিবে না। রাজপ্রসাদভোগী টেনসন ও প্লায়র, শত্রুপীড়িত যমপীড়িত ব্যাধিপীড়িত বা প্রেমপীড়িত না হইলে দান্তে বা মিল্টন জন্মে না।

এইরূপে ভারতে উপনিষদ ও দর্শনের উৎপত্তি। ভারতভিন্ন আর কোথাও তাহাদিগকে পাওয়া না, আর কোথায়ও তাহাদের অভ্যুদয়ের সম্ভাবনা নাই। যাঁহারা অবস্থানের মর্ম্মস্পর্শ না করেন, তাঁহারা কবি নহেন, দার্শনিকও নহেন, ইতিহাস লিখিতে পারেন না। সংসার-পীড়িত, প্রকৃতি-পীড়িত কুটীরবাসী কয়েকজন সন্ন্যাসী স্বপ্রধান হইয়া একাকী উহাদিগকে উৎপাদন করেন। এই স্বানুগত মহাপুরুষদিগকে শাক্য-সিংহ একত্র করিয়াছিলেন। বৌদ্ধ দর্শন শাক্যসিংহের পূর্ব্বতন, শাক্য তাহার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি। এক শাক্য সহস্র শাক্যের উত্তরাধিকারী। কিন্তু তিনি না জন্মিলে তাহারা অস্ফুট রহিয়া যাইত। শাক্য স্বপ্রধান মহাজনদিগকে একত্র করিয়া প্রভূতপয়ঃস্রোতস্বিনী উৎপাদন করেন। শেষে স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল ভাসাইয়া দেন।

সন্ন্যাসী প্রকৃতি স্বাবলম্বনপরাঙ্মুখ, অদৃষ্টপরায়ণ, বর্ত্তমান উপেক্ষী, ভবিষ্যন্মুখ। দিন ছাড়িয়া তিনি অনন্ত গণনা করেন,

আকার ছাড়িয়া আকাশের সেবা করেন, গৃহ ছাড়িয়া বিশ্ব অবলম্বন করেন। দুদিনের পীড়া, দুদিনের যন্ত্রণা, দুদিনের দুঃখ,দুদিনের পরাধীনতা তাঁহাকে বিচলিত করিতে সমর্থ নহে। কত কোটি কোটি যুগ তিনি যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। আরও কত কোটি যুগের প্রায়শ্চিত্তে তাঁহার মর্ম্মগত ব্যাধির উপশম হইবে। যন্ত্রণা যাহার নিত্যভাগ্য, যন্ত্রণার যন্ত্রণাত্ব যাহার নিকট উপশম হইয়াছে, কে তাহাকে যন্ত্রণা দেয়, তাহা অব-ধারণ করিতে সে উৎসুক নহে। সে যন্ত্রণায় কে রাজা হইল, কে করভারে পীড়ন করিতেছে, ভারতবাসী কৃষক পর্য্যন্তও তাহার অনুসন্ধান করে না। সহস্র সহস্র বৎসরে ভারতের প্রত্যেকেই সন্ন্যাসী-বৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে। পথে ঘাটে এখনও এত দার্শনিক আর কোনও দেশে মিলে না,মিলিবে না। ভারত-বর্ষের ইতিহাস নাই, কারণ ভারতবাসী সংসারস্পৃহ নহে। পরাধীনতা ভারতবাসীর পীড়াজনক নহে, কারণ দার্শনিকতায় তাহার পৃষ্ঠাস্থি চূর্ণিত করিয়াছে। যন্ত্রণা তাহার অদৃষ্ট, রাজা কে হইল, কে যন্ত্রণা দেয়, তাহাতে তাহার ইষ্টানিষ্ট কি? মাসিদন-পতি সেকন্দর ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া ছিলেন, কখন? বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতে প্রচার হইবার পরে। যদি সন্ন্যাস ধর্ম্ম ভারতবর্ষে প্রচার না হইত, যদি আধিভৌতিক ক্রিয়া মাত্র পরিহর্ত্তব্য বলিয়া গণিত না হইত, যদি সাংসারিক সুখ কীটময় শবের ন্যায় ন্যক্কার সহিত পরিত্যাজ্য না হইত, তবে কি সিকন্দর ভারতভূমি স্পর্শ করিতে পারিতেন? যদি বৈদিক প্রকৃতি আর্য্যসন্তানকে তখনও অনুপ্রাণিত করিত, তবে ভারতের মুখ আজ অন্যবিধ দেখিতাম। কবি সোৎসুকচিত্তে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন—তখন তাহারা ক'জন ছিল?

তখন তাহারা পাঁচজন হইলেও পাঁচজন অসুর ছিল। পরন্তন ভারতবাসী অসুর প্রকৃতি উপেক্ষা করিয়া দার্শনিক হইয়া পড়িয়াছিল। সংখ্যার পরিমাণে অধিক হইলেও প্রকৃতির বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল। সিংহের ঔরসে গর্দ্দভ জন্মিলে কোটি গর্দ্দভ একটী সিংহের সমকক্ষ বলিয়া পরিগণিত হয় না।

হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়ে ভারতবাসীদিগকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। হিন্দুধর্ম্ম, বিষাদের ধর্ম্ম , মুসলমান-ধর্ম্ম আনন্দের ধর্ম্ম। খৃষ্টধর্ম্ম আনন্দের ধর্ম্ম। মুসলমান ধর্ম্ম সংস্কৃত খৃষ্ট ধর্ম্ম মাত্র। সুতরাং মূল প্রকৃতি আনন্দ-শীলতা ফল-প্রকৃতিতেও সঞ্চারিত হইয়াছে। তাপাধিক মরু জীবন আরবদিগকে শীত প্রধান দেশবাসী অপেক্ষা অধিকতর প্রফুল্ল করিয়াছে। ধর্ম্ম সংস্কারকের প্রকৃতি ধর্ম্মপ্রকৃতি ও ধর্ম্ম উপাসিত দেব প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত করে। এজন্যও নেষ্টরিয়ান খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রফুল্লতর। যে কারণে আরবপ্রকৃতি প্রফুল্লতর করিয়াছে, পারস্য, অফগান, ও মোগল প্রকৃতিও সেই কারণে কিয়ৎপরিমাণে শাসিত করিয়াছে। জাতীয় প্রকৃতির প্রভুত্ব ধর্ম্ম-প্রকৃতির উপর যত অধিক, ধর্ম্মপ্রকৃতির প্রাধান্য জাতীয় প্রকৃতির উপর তাহা অপেক্ষা অল্পতর নহে। হিন্দুধর্ম্ম কিরূপে আর্য্য প্রকৃতি বিবর্জ্জিত করিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে উল্লেখ করাগিয়াছে। সেইরূপ কারণেও মহম্মদীয় ধর্ম্ম মোগল ও পাঠান দিগকে হিন্দুদিগের অপেক্ষা প্রফুল্লতর করিয়াছে।

হিন্দু বৈরাগী ও মুসলমান সংসারী। গৃহশূন্য বৈরাগীর আশ্রয় অনন্তের ক্রোড়ে। একজন চিন্তাপরায়ণ, অন্য কার্য্যপরায়ণ। হিন্দু বিষণ্ণ, মুসলমান প্রফুল্ল। হিন্দু পরার্থপরায়ণ, মুসলমান স্বার্থপরায়ণ। যাহার [illegible] নাই [illegible]রের জন্যই ভাবিবে, হিন্দু পারকাল-

প্রমুখ, মুসলমান বর্ত্তমান লইয়া ব্যস্ত। বিশ্বসংসার মুসলমানের সুখের জন্য, হিন্দুর বিশ্বসংসার সেবার কারণ। হিন্দু-ভিন্ন বসুধৈব কুটুম্বকম্ আর কে বলিতে পারে? গৃহশূন্য বৈরাগী ভিন্ন আর কাহার প্রাণ জগতের জন্য কাঁদে? মুসলমান সাম্প্রদায়িক, হিন্দু সার্ব্বজনীন। হিন্দুর একটী সদাচরণ লক্ষ কর।
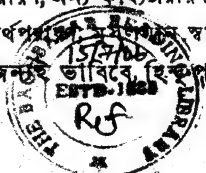
"আব্রহ্মণো যে পিতৃবংশজাতা, মাতুস্তথা বংশভবা মদীয়াঃ।
বংশদ্বয়ে যে মম দাসভূতা ভৃত্যাস্তথৈবাশ্রিতসেবকাশ্চ।
মিত্রাণি সর্ব্বে পশবশ্চ বৃক্ষাঃ দৃষ্টা হ্যদৃষ্টাশ্চ কৃতোপকারাঃ।
জন্মান্তরে যে মম সঙ্গতাশ্চ তেভ্যঃ স্বধাপিণ্ডমহং দদামি।"

হিন্দুর ইতিহাস নাই, মুসলমানের ইতিহাস আছে। হিন্দুর স্বর্গে ধ্যান ধারণা। মুসলমানের স্বর্গে সুধা ও বারবনিতা। হিন্দুর স্থাপত্য দেবমন্দিরে, মুসলমানের স্থাপত্য উদ্যান প্রাসাদে। মুসলমান উপাসনা করিতে দল বাঁধে, হিন্দু চিরদিন একাকী। হিন্দুর পরিণাম শ্মশানের চিতাভস্মে, মুসলমানের অন্তিম শয্যা মরকত-খচিত কবর-কুট্টিমে। হিন্দুর স্বর্গবাস কষ্টসাধ্য, মুসলমানের সহজলভ্য। হিন্দু বিশ্বাস, মুসলমান কর্ম্ম, হিন্দু ধ্যান, মুসলমান সাধনা। বিষাদ-প্রধানতা সাধারণ হিন্দুর জাতীয় চরিত্র। মহম্মদীয় ধর্ম্মের সংস্পর্শে হিন্দুর অনন্ত পরায়ণতা কিয়ৎপরিমাণে ক্ষুন্ন হইয়াছে। দর্শন উপনিষৎ ও বৌদ্ধধর্ম্মের সমসাময়িক জাতীয় চরিত্র যত বিষাদপ্রধান ছিল, এখন তত নাই। পৌরাণিক ধর্ম্মে বৈদিক প্রফুল্লতা পুনর্জীবিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছিল, এবং কিয়ৎপরিমাণে সফলও হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্মের ন্যায় পৌরাণিক ধর্ম্ম কর্ম্ম-কাণ্ড প্রধান। বৈদিক ধর্ম্মে চৈতন্যের, পৌরাণিক ধর্ম্মে শক্তি

চৈতন্যের উপাসনা বিহিত হইয়াছে। মহম্মদীয় ধর্ম্ম সংসর্গজনিত জারজ নানক ও বৈষ্ণব ধর্ম্ম অপেক্ষাকৃত অবিষাদপ্রধান। তথাপি ভারতবর্ষীয় হিন্দুর জাতীয় চরিত্র যে বিষাদপ্রধান সন্দেহ নাই। বৈদিক ধর্ম্ম পরায়ণ পারসীর সহিত হিন্দুর তুলনা করিলে একটীকে যুবক ও অন্যটীকে বৃদ্ধ বলিয়া প্রতীত হইবে। পারসী আর্য্যপ্রকৃতি, হিন্দু অনার্য্যপ্রকৃতি। হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম অদৃষ্টবাদিতা, জাতীয় চরিত্র বিষণ্ণতা। জাতীয় চরিত্র অপরিবর্ত্তনীয় নহে, কিন্তু শত বৎসরেরও অনুভবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটে না। হিন্দুর জাতীয় চরিত্রের পরিবর্ত্তন প্রার্থনীয় কি না?

---

# বেদান্তসার।

চিত্তবৃত্তি বিন্যাসের নাম উপাসনা। উপাসনা আত্মজ্ঞান সাধনের উপায়। কোন প্রকার সকাম বা নিষ্কাম কর্ম্মে মোক্ষ নাই। নিষ্কাম কর্ম্ম অন্যতর সোপান। মোক্ষ কেবল জ্ঞানে— "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" অদ্বৈত জ্ঞানে। প্রার্থনা উপাসনা নহে। প্রার্থনা দ্বৈতজ্ঞান পরিচায়ক। প্রকৃতি আত্মা ও পরমাত্মা সকলই ব্রহ্ম—"ত্রয়ং সদা বিন্দতে ব্রহ্মমেতৎ"। প্রথমে সকাম কর্ম্ম করিবে তাহার পর সর্ব্ব কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া সমাধিস্থ হইবে।

অত্রান্তরং ব্রহ্মবিদো বিদিত্বা
লীনা ব্রহ্মণি তৎপরা যোনিমুক্তাঃ।

ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইলে মুক্তি হয়, আর জন্ম হয় না। দেবতাদেরও পুনর্জ্জন্ম আছে, কর্ম্মফল কাটে নাই। ব্রহ্মজ্ঞানীর পুনর্জ্জন্ম নাই।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্চিদ্যতে সর্ব্বসংশয়ঃ
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।
যদা পশ্য পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং
পুরুষং ব্রহ্মযোনিং তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।

মন অবলম্বনশূন্য থাকে না। শুভাবলম্বন না পাইলে অসৎ কর্ম্মে ধাবমান হইবে, এজন্য অনুক্ষণ উপাসনা কর্ত্তব্য। মন ব্রহ্মপরায়ণ হইলে চক্ষু মন্দ দেখিবে না, কর্ণ মন্দ শুনিবে না।

পদার্থ ইন্দ্রিয়ের সম্মুখীন হইলেও মনের অভাবে প্রত্যক্ষ হইবে না।

উপাসনা দ্বিবিধ, যজ্ঞ ও ধ্যান। কোন পদার্থকে দান করিবার নাম যজ্ঞ। যে যত উৎকৃষ্ট পদার্থ দান করিতে পারে, তাহার যজ্ঞ তত ভাল।

কামনার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট সংসারে মানুষের কিছু নাই। সর্ব্বকামনা ব্রহ্মকে উৎসর্গ করা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যজ্ঞ। যে করে সেই সন্ন্যাসী। যজ্ঞ সাধন করিতে হইলে, বাক্য ও মন এ উভয়ের সংস্কার আবশ্যক। একচক্র রথের ন্যায় ইহাদের অন্যতর যজ্ঞ সাধনে সমর্থ নহে। পরন্তু চেষ্টা করিলে আপনিও বিনষ্ট হয়।

প্রবৃত্তি না হইলে কর্ম্ম হয় না। কামনা ত্যাগ নিবৃত্তিমাত্র, সুতরাং উহা কর্ম্ম নহে। সকল প্রবৃত্তির সম্যক পরিচালনা করিতে হইবে, এ উপদেশ ভাল নহে। প্রবৃত্তির উৎকর্ষণ পাশ্চাত্য উপদেশ। প্রবৃত্তিমার্গে স্বর্গ আছে, মোক্ষ নাই। জ্ঞানী লোক স্বর্গের আকাঙ্ক্ষা করে না। মূর্খের প্রার্থনা স্বর্গলাভ। মোক্ষলাভ নিবৃত্তি মার্গে। প্রবৃত্তি যত চালিত হইবে, বাসনা তত বাড়িবে, বাসনা হইতেই পুনর্জ্জন্ম। প্রবৃত্তি যত নিরাশ হইবে, মোক্ষ তত নিকট হইবে। প্রবৃত্তির নিরাশ ইহাই উপনিষৎ-সিদ্ধ। ইহাও বৌদ্ধ ধর্ম্মের উপদেশ।

যে যেমন সাধনা করে, তাহার তেমনি গতি হয়। যে ব্রহ্ম সাধনা করে, সে ব্রহ্মত্ব লাভ করে, তাহার আর পুনর্জ্জন্ম হয় না। যে দেবত্ব সাধনা করে, তাহার দেবযান হয়; যে বাসনার সাধনা করে, সে পিতৃযান লাভ করে। কর্ম্মমার্গে স্বর্গ, জ্ঞানমার্গে দেবত্ব ও ব্রহ্মত্ব। পূর্ণ জ্ঞানে ব্রহ্মত্ব, অপূর্ণ জ্ঞানে

দেবত্ব। একবার দেবত্ব লাভ করিলে আর নীচ জন্ম হয় না। উত্তরোত্তর পূর্ণ জ্ঞান লাভ হইয়া ব্রহ্মত্ব লাভ হয়। স্বর্গক্ষয়ে কর্ম্মী পুরুষ পুনর্ব্বার পৃথিবীতে জন্ম লাভ করে।

মৃত্যুর পরে কি? সবাই জিজ্ঞাসা করে, জন্মের পূর্ব্বে কি? কেহ জিজ্ঞাসা করে না। অথচ উভয়ই কুটিল রহস্য। আত্মার অমরত্ব যাঁহারা স্বীকার করেন, অনন্তত্ব স্বীকার করেন না, তাঁহারা আত্মাকে সৃষ্ট বলেন বা দ্বৈতবাদ স্বীকার করেন। তাঁহাদের জন্মপূর্ব্ব-ঘটনা অনুসন্ধান করিতে হয় না। মানুষের জনন-প্রবৃত্তির অপেক্ষায় ঈশ্বর এক একটী আত্মা হাতে করিয়া বসিয়া থাকেন। বস্তুতঃ অনন্তত্ব-বিহীন অমরত্ব অতি অকিঞ্চিৎকর। যাহা অনন্ত, তাহা আদিতেও অনন্ত, অন্তেও অনন্ত, এ কথা বলিবার আবশ্যক নাই। অমরত্বের এক দিকে শূন্য। যাঁহারা আত্মার অনন্তত্ব স্বীকার করেন, তাঁহারা স্ফটিকে ফুলের রঙ্গের মত, বুদ্‌বুদে আদিত্যজ্যোতির ন্যায়, আত্মাকে পরমাত্মার জ্যোতি ভিন্ন, অদ্বৈত ভিন্ন আর কিছুই স্বীকার করিতে পারেন না। হয় পাশ্চাত্য বিজ্ঞান মতে আত্মাকে দেহের জ্যোতি বলিতে হইবে, না হয়, আত্মাকে অনন্ত ব্রহ্ম বলিতে হইবে। তৃতীয় পন্থা নাই। আত্মাকে অমর বলিয়া পরকালের ন্যায় পূর্ব্বকালের ব্যবস্থা না করিলে শশকের পত্রাচ্ছাদনে শিরোরক্ষা ঘটে। দুর্জ্ঞেয় সুতরাং অচিন্তাকর্ত্তব্য, ইহা না ভক্তির না জ্ঞানের কথা।

বৌদ্ধ ও বৈদান্তিক উভয়েই কর্ম্মফল স্বীকার করেন, কর্ম্ম ও বাসনা পুনর্জন্মের কারণ। বাসনার নিরাশ হইলে জন্ম হয় না, বাসনা থাকিলেই জন্ম হইবে। সে বাসনা যে কোন প্রকার। ধার্ম্মিক হইবার বাসনা কর, পুনর্জন্ম হইবে, মোক্ষ

পাইবার বাসনা কর, পুনর্জ্জন্ম হইবে। বাসনা জন্ম-প্রসূতি। কি রকমে জন্ম হইবে, মনুষ্যরূপে, পশুরূপে, কীট কি পতঙ্গ-রূপে, তাহা কর্ম্মফলে নিশ্চিত হয়। সাংখ্যকার বলেন, কর্ম্ম-ফল অকাট্য, "অবশ্যমেব ভোক্তব্যং কৃতং কর্ম্ম শুভাশুভং"। বৈদান্তিকেরা তিন প্রকার কর্ম্ম স্বীকার করেন—প্রালব্ধ, সঞ্চিত ও আগামী। যাহা করিতেছ ও যাহা করিবে, জ্ঞানযোগে ইহাদের ব্যত্যয় হইতে পারে। কিন্তু প্রালব্ধ কর্ম্মফল অবশ্য ভোগ করিতে হইবে। কর্ম্মফল ভোগে কাটে। প্রালব্ধ কর্ম্ম-ফল-ভোগ শেষ হইলে জ্ঞানজনিত মোক্ষ লাভ হয়। যাহার জ্ঞান জন্মিয়াছে, অথচ কর্ম্মফল-ভোগ কাটে নাই, তাহাকে মোক্ষের জন্য অপেক্ষা করিতে হইবে। এ জন্য জীবন্মুক্তি—জীবিতাবস্থায় মোক্ষ ঘটে না। কর্ম্মফল-ভোগী জ্ঞানবান্ কর্ম্মফল ভোগ করিতেছেন বলিয়া কাতর নহেন। স্বাস্থ্যের সোপান জানিয়া তিনি রোগকে বিড়ম্বনা মনে করেন না।

জগৎ সৃষ্ট কি অনাদি, ঈশ্বর আছেন কি না, আত্মা আছে কি না, বৌদ্ধেরা এ সকল গূঢ় রহস্যের আলোচনা করেন না। যাহা আছে, তাহা প্রত্যক্ষ, তাহাই স্বীকার করিয়া নামরূপের আলোচনাতেই বৌদ্ধধর্ম্ম সমাপ্ত। জগৎ দুঃখময়, দুঃখের কারণ কি, কিরূপে দুঃখের বিনাশ হয়, এই প্রশ্নের মীমাংসা-তেই বৌদ্ধ দর্শন পরিপূর্ণ। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি পাও-য়ার নাম মোক্ষ—"ত্রিবিধ দুঃখস্যাত্যন্তনিবৃত্তিরত্যন্তপুরু-ষার্থঃ"—এইখানে বৌদ্ধ ও সাংখ্য দর্শনের একতা, বেদান্ত দর্শনে পরম ব্রহ্মে আত্মার বিলয়ের নাম মোক্ষ।

তথাপি বৌদ্ধদর্শনের মর্ম্মে আত্মার অস্বীকার। বৌদ্ধেরা আত্মা স্বীকার করে না, অথচ পুনর্জ্জন্ম স্বীকার করে। ইহা

আপাততঃ বিসম্বাদী বলিয়া বোধ হইতে পারে। মৃত্যু হইলে দগ্ধ করিয়া শরীরের বিনাশ করা হয়, আত্মা স্বীকার না করিলে পুনর্জন্ম কাহার হয়, এ কথা জিজ্ঞাস্য হইতে পারে। বৌদ্ধ দর্শনে স্পষ্টতঃ আত্মা স্বীকার করাও হয় নাই, অস্বীকার করাও হয় নাই। সুতরাং এ প্রশ্নেরও স্পষ্ট কোন মীমাংসা করা হয় নাই। তথাপি আত্মা অস্বীকারের মত অস্পষ্টভাবে এ প্রশ্নেরও উত্তর বৌদ্ধ দর্শনে পাওয়া যায়। বৈদান্তিকেরা দুই প্রকার রূপ স্বীকার করেন—স্বরূপ রূপ ও প্রবাহ রূপ। আমি যখন বলি যে "কাল গঙ্গার এই ঘাটে স্নান করিয়াছিলাম" তখন সত্য কথা কহি কি না? কালিকার আমি আজিকার আমি নহি, কালিকার ঘাট আজিকার ঘাট নহে, কালিকার সে গঙ্গা আজিকার নাই, কোথায় চলিয়া গিয়াছে। অথচ কালি এই ঘাটে আমি স্নান করিয়াছিলাম, এ কথাও সত্য। কালিকার কিছুই স্বরূপে আজিকার নাই, কিন্তু প্রবাহরূপে সকলেই আছে। কালিকার আমি স্বরূপত আজি নাই, কিন্তু প্রবাহরূপে আজ আছি, কাল থাকিব, দশদিন পরেও থাকিব, জন্মে জন্মে থাকিব। বৃক্ষাদির আত্মা নাই, সকল দার্শনিকেই বলে, সে বৃক্ষাদি প্রবাহরূপে বহু দিন থাকে। আত্মা আছে বলিয়া কালিকার আমি আজি আছি, একথা সত্য নহে। আত্মা না থাকিলেও প্রবাহরূপে জীব জন্ম জন্ম থাকিতে পারে। এই জন্য আত্মা স্বীকার না করিলেও বৌদ্ধগণের জন্মান্তর স্বীকারে বাধা ঘটে না। এখানে বৌদ্ধমত বলিয়া যাহা উল্লিখিত হইল, তাহা প্রাচীন বৌদ্ধমত।

অনেকে আত্মা ও পরমাত্মার একতা স্বীকার করিলেও প্রকৃতির সহিত আত্মার একতা, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" স্বীকার

করিতে চাহেন না। বৈদান্তিকেরা ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন। ঘটের নিমিত্ত কারণ কুম্ভকার, উপাদান কারণ মৃত্তিকা প্রভৃতি। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত বেদান্ত "ব্রহ্ম জগৎস্থষ্টি করিয়াছেন", এরূপ কথা না বলিয়া "ব্রহ্ম হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে", এইরূপ বলেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ"। কর্ত্তৃকারকের পরিবর্ত্তে অপাদান কারক ব্যবহার হয়। জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব্রহ্ম বলিয়া জগৎকে ব্রহ্মময়, জগতই ব্রহ্ম-এরূপ বুঝিতে বৈদান্তিকের কোন আপত্তি হয় না। জগৎ মিথ্যা বলিয়াও বেদান্তে উল্লিখিত হইয়াছে। যাহার নিমিত্ত ও উপাদান কারণ ব্রহ্ম, তাহা মিথ্যা কিরূপে হইবে, বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইতে পারে। বস্তুত ব্রহ্ম ভিন্ন যখন আর কিছু নাই, সকলই যখন ব্রহ্ম, তখন জগৎ আর কোথায় রহিল? রজ্জুকে যদি রজ্জু বলা যায় তাহা হইলে ভ্রম হয় না। কিন্তু রজ্জুকে সর্প বলা মিথ্যা। রজ্জুতে সর্প ভ্রমের ন্যায় অজ্ঞানী লোকেরা ব্রহ্মকে জগৎ বলিয়া ভ্রম করে। সকলই ব্রহ্ম, জগৎ বলিয়া কিছু নাই।

ইতিপূর্ব্বে যজ্ঞ ও ধ্যানের কথা বলিতে ছিলাম। অনেকের সেই কথাই ভাল লাগিবে, তুমি আমি নাই, ভেদাভেদ নাই, সকলই ব্রহ্ম, ইহা বুঝিতে কাহারও কষ্ট হইতে পারে। এ জন্য হিন্দু-শাস্ত্রে অধিকারী ভেদে উপদেশ দিবার ব্যবস্থা বারম্বার উল্লিখিত হইয়াছে। অধিকারী ভেদ না করিয়া সকলকে এক প্রকার উপদেশ দিলে কাহারও সর্ব্বনাশ ঘটিতে পারে। আমার আচার্য্যকে কাহারও নিকট প্রতিমার আবশ্যকতা কাহারও নিকট অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিতে

দেখিয়াছি। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তন সূত্রে লিখিত হইয়াছে, যে, দুঃখ, দুঃখের কারণ ও দুঃখ হইতে মুক্তি পাইবার উপায়, সংসার-আসক্ত অসংস্কৃত লোকে বুঝিবে না বলিয়া বুদ্ধদেব বড়ই চিন্তিত হইয়া ছিলেন।

বৈদান্তিকেরা বলেন, যাহারা রাগ দ্বেষ আসক্তি ও ঘৃণা হইতে মুক্ত হয় নাই, তাহারা ব্রহ্ম নিরূপণে অসমর্থ। যোগ-বাশিষ্ঠে একটী আখ্যায়িকা আছে। এক ব্যক্তি পৃথিবীর অন্ত নিরূপণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিল। বহু শত বৎসর ভ্রমণ করিয়াও পৃথিবীর অন্ত নিরূপণে অসমর্থ হইলে সে দ্রুততর গতি লাভের জন্য হরিণরূপ ধারণ করিয়াছিল। সেইরূপে সে একদা শিকারীর বাগুরাবদ্ধ হইয়া রাজার গৃহে বন্দী হয়। যে পৃথিবীর অন্ত নিরূপণে সমর্থ নহে, সে মায়ার অন্ত নিরূপণে কিরূপে সমর্থ হইবে? তাহার পর মায়ার অতীত ব্রহ্ম কত দূর?

যজ্ঞ ও ধ্যান দ্বিবিধ হইলেও কোন স্পষ্ট রেখায় দুইটী বিচ্ছিন্ন নহে। ইহারা পরস্পর সাপেক্ষ। যজ্ঞ সমাধিকে সাহায্য করে, আবার সমাধি যত উন্নত হইবে, যজ্ঞ তত মহত্তর হইবে। যতই উৎকৃষ্ট যজ্ঞ করিতে পারিবে, সমাধি তত একাগ্র হইবে। মানুষের দুটী পা, ভিন্ন হইলেও, দক্ষিণে ও বামে বিভক্ত হইলেও, একটীকে ছাড়িয়া একটীতে চলে না। একের পতনে দুইএরই পতন হয়। মনের মধ্যে আসিয়া দুই জনে যুক্ত হইয়াছে। তাহার পর একটী বাক পথে, অন্যটী অবাক পথে নামিয়া গিয়াছে। মৌনাচরণ ও মনন করিব বলিয়াই আমাদের নাম মানব হইয়াছে। যাগ যজ্ঞে পিতৃ-লোক লাভ হয়, জ্ঞানে দেবলোক লাভ হয়। যজ্ঞে চন্দ্র-মণ্ডলে বাস হয়, জ্ঞানীর পরিণাম সূর্য্যমণ্ডলে। যজ্ঞের ফল-

ভোগ হইলে পাপের ফলভোগ আরম্ভ হয়। চন্দ্রমণ্ডল হইতে বৃষ্টিরূপে জীব ভূতলে নিপতিত হয়। কর্ম্মফলানুসারে যে জন্ম লাভ করিতে হইবে, সেই জাতীয় কোন জীব সেই বৃষ্টিজল গ্রহণ করে। সেই জীবের ঔরসে ফলভোগীর জন্ম হয়। জ্ঞানমার্গে যাহারা দেবলোক লাভ করে তাহাদের আর পতন হয় না।

কর্ম্মে অবিদ্যার বিনাশ হয় না, পুনশ্চ উত্তরোত্তর তাহার বৃদ্ধি হয়। পুনঃপুনঃ জন্মলাভের কারণ ঘটে। জ্ঞানেই কেবল অবিদ্যার বিনাশ হয়, বাসনা নাশ হইলে পুনর্জন্মের কারণ ঘটে না। এইজন্য জ্ঞানমার্গ সর্ব্বতোভাবে কর্ম্মমার্গের শ্রেষ্ঠ। নিষ্কাম কর্ম্ম জ্ঞানের সোপান, জ্ঞান অবিদ্যা বিনাশ-হেতু। এইখানে উত্তর ও পূর্ব্ব মীমাংসার মিলন।

আত্মা কর্ম্মফল ভোগ করে না। আত্মা নির্ব্বিকার, নির্গুণ ও নির্লিপ্ত। আত্মা সুখেরও ভাগী নহে, দুঃখেরও ভাগী নহে। কর্ম্মফল ভাগী জীবের সূক্ষ্ম দেহ। সূক্ষ্ম দেহ পঞ্চ প্রাণ মনোবুদ্ধি ও দশেন্দ্রিয় সমন্বিত। আত্মা নিরুপাধি। নীলকুসুম সন্নিধানে স্ফটিককে যেমন নীলবর্ণ বোধ হয়, অবিদ্যা বশতঃ আত্মাকেও উপাধিবিশিষ্ট বোধ হয়। তাই অজ্ঞান লোক আত্মাকে পঞ্চ কোষময় বা ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপারী বলিয়া মনে করে। আত্মার অবস্থিতি হেতু ইন্দ্রিয়গণ কার্য্য করে বটে, কিন্তু সে কর্ম্ম আত্মার নহে। আত্মা নিষ্কর্ম্মা। সূর্য্যোদয়ে লোকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তাই বলিয়া সূর্য্য সে সকল কর্ম্মের কারণ নহে। আত্মা কূটস্থ শুদ্ধ চৈতন্য।

আত্মা দেহ নহে, ইন্দ্রিয় নহে, মন নহে, বুদ্ধি নহে, প্রকৃতি নহে, তাহাদের সকলের সমষ্টিও নহে।

# ভক্তি সূত্র।

জীবত্ব জড়ত্ব মাত্র, জড়ত্ব দুর্ব্বলতা মাত্র, দুর্ব্বলতা বিকাশের অভাবজাত। জড় বিকশিত হইলে জীব হয়, জীব বিকশিত হইলে জীবত্ব হইতে মুক্তি পায়, দেবত্ব লাভ করে। জীববৃত্তি শারীরিক ও মানসিক। শারীরবৃত্তি মানসসাপেক্ষ, মানস বৃত্তি শারীরসাপেক্ষ। শারীরবৃত্তির উন্নতি বা অবনতি স্থূল গ্রাহ্য। সুতরাং শারীরবৃত্তির অনুশীলন বর্ব্বর ও সভ্যকে যুগপৎ আকর্ষণ করে। সর্ব্ব বৃত্তির সম্যক অনুশীলনে জড়ত্ব, দুর্ব্বলতা বা জীবত্বের মোচন হয়। তাহার নাম মুক্তি।

শারীরবৃত্তি সাধারণকে আকর্ষণ করে, মানসবৃত্তি কেবল পণ্ডিতগ্রাহ্য। এজন্য পণ্ডিতেরা মানসবৃত্তির অনুশীলনে সাধারণের মনোযোগ আকর্ষণের চেষ্টা করেন। পণ্ডিতেরা আত্ম অনুসারে কেহ জ্ঞানানুশীলনের, কেহ ভক্তি অনুশীলনের মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছেন। কাহারও মতে জ্ঞানে মুক্তি, কাহারও মতে ভক্তিতে মুক্তি। "ভক্তিতে মিলয়ে কৃষ্ণ তর্কে বহু দূর।" পশু ভাবচালিত, মনুষ্য জ্ঞানচালিত। যুবা ভাবপ্রবণ, বৃদ্ধ বুদ্ধিপ্রবণ; বেদ ভাবুকের কবিতা, উপনিষদ বুদ্ধিমানের দর্শন্। এজন্য দার্শনিক জ্ঞানের গুণপণা, কবি ও ধর্ম্ম প্রচারক ভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব গান করেন।

ভাব প্রাচীনতাকে রক্ষা করে, জ্ঞান নূতনতাকে উদ্ভাবন করে। ভাবুক স্থিতিশীল, জ্ঞানী উন্নতিশীল; ভাবুক স্বদেশ ও স্বজাতিপ্রিয়, জ্ঞানী সার্ব্বজনিক ও সার্ব্বদেশিক। ভাবুক প্রফুল্ল, জ্ঞানী বিষন্ন; ভাবুক উন্মত্ত, জ্ঞানী প্রসন্ন। ভাব-প্রবণ মনুষ্য পশু, জ্ঞান-প্রবণ পশু মনুষ্য সদৃশ। ভাব মনুষ্যকে পশুর

সহিত সংযোগ করে, জ্ঞানে পশুকে মনুষ্যের সহিত সংযোগ করে।

কিন্তু জ্ঞানেও জীবত্ব ঘুচে না, ভক্তিতেও মুক্তি মিলে না। যখন উহারা প্রত্যেকে আপন স্বরূপ হারাইয়া ফেলে,—জ্ঞানকে জ্ঞান বলিয়া চিনা যায় না, ভক্তিকে ভক্তি বলিয়া উপলব্ধি হয় না, যখন একটী হইতে অন্যটীকে পৃথক করা যায় না, তখনি মুক্তি লাভ হয়।

মুক্তি কেবল প্রেমে। প্রেম ভক্তি নহে, প্রেম জ্ঞান নহে; ভক্তি ও জ্ঞান উভয়ে সমভাবে পূর্ণ অনুশীলিত হইলে, দুই জনে যখন অবিচ্ছেদ্যভাবে মিশিয়া যায়, মনের সেই অবস্থার নাম প্রেম। প্রেমিকের জ্ঞান নাই, প্রেমিকের ভক্তি নাই। সে ক্ষেপা ভোলানাথ। অজ্ঞান, অভক্ত প্রেমিক হইতে পারে না।

আরাধ্য বিষয়ে পরানুরক্তির নাম ভক্তি। অনুরাগের ক্ষণিক উচ্ছ্বাসকে ভক্তি বলা যায় না; এবং পুত্র কলত্রে যে প্রীতি, তাহাকেও ভক্তি বলা যায় না। জ্ঞান না হইলে ভক্তি হয় না। যাহাকে জানি না, তাহাকে ভক্তি করি না, তাই বলিয়া যাহাকে জানি. তাহাকেই ভক্তি করি না। ভক্তি ও দ্বেষ উভয়ই জ্ঞান-মূলক। আরাধ্য বলিয়া জানিলে আরাধ্য বিষয়ে স্বতঃই যে পরানুরক্তি জন্মে, তাহাকে ভক্তি বলা যায়। সুতরাং জড়, অজ্ঞান, বা বাতুলের ভক্তি সম্ভাবনা নাই। এবং জ্ঞানকে ভক্তিবিরোধী বলা যুক্তিসঙ্গত নহে। তাই বলিয়া জ্ঞানকে ভক্তি বলা যায় না, জ্ঞান ভক্তির কারণ মাত্র, ভক্তি ভাববৃত্তি, জ্ঞান বুদ্ধিবৃত্তি। যাহাকে ভয় করি, তাহাকে ভক্তি করি না; ভয় ও ভক্তি বিসম্বাদী। ভয় বিরাগ উৎপাদন করে, ভক্তি

অনুরাগের চরম মাত্রা। কিন্তু প্রণয়ীর অনুরাগ ভক্তি নহে, সেখানে সমান সমান, মহতের প্রতি ক্ষুদ্রের পরানুরাগকে ভক্তি বলি। প্রণয়ীর অনুরাগে স্বর্গ লাভ ঘটে, কিন্তু মুক্তি লাভ হয় না। কৃষ্ণানুরাগী ব্রজাঙ্গনা কৃষ্ণকে প্রণয়ী বলিয়া ভাল বাসিত, ভালবাসার অনুশীলন তাহারা যথেষ্ট করিয়াছিল, তজ্জন্য তাহারা ভাল বাসার যথেষ্ট উন্নতি বা স্বর্গ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু কৃষ্ণকে আরাধ্য বলিয়া অনুরক্ত হয় নাই, সুতরাং মুক্তি লাভ করিতে পারে নাই। আরাধ্য যত উন্নত হইবে, ভক্তি তত শ্রেষ্ঠতর হইবে, মুক্তি তত নিকট হইবে। বৃক্ষ বা ধেনুকে আরাধ্য বলিয়া তাহার প্রতি অনুরক্ত হইলে স্বর্গ লাভ ঘটে, এবং কাহাকেও আরাধ্য বলিয়া বিবেচনা না করা, কাহারও প্রতি ভক্ত না হওয়া অপেক্ষা বৃক্ষ বা ধেনুভক্তের অবস্থা শ্রেয়স্কর। এক দিকে আরাধ্যকে আরাধ্য বলিয়া না জানায়, তাহার ভক্ত না হইয়া কেবল প্রণয়ী হইলে যেমন মুক্তি ঘটে না, পক্ষান্তরে আরাধ্য পদার্থ ভক্তির নিয়ন্তা হওয়ায়, এবং আরাধ্যের প্রকৃতি অনুসারে ভক্তির পরিমাণ সসীম বা অসীম হওয়ায় যাহার দেবতা যত নিকৃষ্ট, তাহার ভক্তি মুক্তি দিতে তত অক্ষম। জ্ঞান যত অনুশীলিত হইতে থাকে, আরাধ্যের মহত্ত্ব তত অধিক হয়; যাহা পূর্ব্বে আরাধ্য ছিল, এখন আর তাহা আরাধ্য হয় না; কিন্তু তাহার নামে যে ভক্তি কর্ষিত হইয়াছিল তাহার স্থানে যে উন্নততর প্রকৃতি আরাধ্যরূপে আসন গ্রহণ করেন, তাঁহার প্রতি সেই কর্ষিত ভক্তি বেগবত্তররূপে প্রধাবিত হয়। কিন্তু মুক্তি এখন দূরে। জ্ঞানচর্চ্চার পরিপন্থী ভক্তিস্রোত। জ্ঞান ভক্তির অগ্রগামী, আরাধ্য নিরূপক জ্ঞান উন্নততর হইয়া যত উন্নত আরাধ্য খুঁজিয়া লয়, ভক্তি তত উন্নত হইতে থাকে।

শেষে সম্যক কর্ষিত জ্ঞান ঈশ্বরকে আবিষ্কৃত করিলে তাঁহার প্রতি যে পরা ভক্তি উদ্দীপিত হয়, আমরা যাহাকে প্রেম বলিয়াছি, সেই সম্যক-জ্ঞান সহচরী পরাভক্তি মুক্তির কারণ। গো বৃক্ষের ন্যায় প্রতিমা ভক্তি স্বর্গদানে সমর্থ, কিন্তু মুক্তি দিতে পারে না। জ্ঞান যাহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াও যাহার পদানত থাকে, সুতরাং ভক্তিও যাহাকে ছাড়িয়া অন্যমুখে ছুটিতে পারে না, সেই চরমলব্ধ পরম আরাধ্য পরাভক্তি মুক্তির একমাত্র কারণ। জ্ঞানের সম্পূর্ণ অভাব, ও ভক্তির সম্পূর্ণ অভাব সমাবস্থা, ইহা মুক্তির কারণ নহে। আংশিক জ্ঞানও ভাবের সমাবস্থা, ইহাও মুক্তির কারণ নহে। উভয়ের পূর্ণতায় উভয়ে যখন অবিচ্ছেদ্যভাবে সমাবস্থ, যে ভাব কেবল অনতিক্রমণীয় ঈশ্বরে সম্ভব, সেই ভক্তি মুক্তির কারণ। অন্য কোন পূর্ণ প্রতীয়মান অপূর্ণ অবস্থায় উহা পাওয়া যায় না। বিবাহে, সন্তান পালনে বা ভক্তিতে স্বর্গ মিলে, কিন্তু প্রেম বিনা আর কিছুতে মুক্তি মিলে না। স্বর্গে জীবত্ব থাকে, মুক্তি জীবত্বের নির্ব্বাণ, ব্রহ্মের স্বারূপ্যলাভ। সামীপ্য ও সাযুজ্যভেদে স্বর্গ নানা প্রকার। তবে কি ব্রহ্মদ্বেষী নাই? আছে। দ্বেষেরও কারণ জ্ঞান। সুতরাং ব্রহ্মদ্বেষীরও ব্রহ্ম জ্ঞান আছে, কিন্তু সে জ্ঞান, রজ্জুতে সর্প জ্ঞানের ন্যায়, জ্ঞান রাজ্যের হইলেও ভ্রম মাত্র। যাহারা ব্রহ্মকে স্বরূপতঃ জানে, তাহারা ব্রহ্মদ্বেষী হয় না। অপূর্ণ জ্ঞান বা ভ্রম অনেক সময় দ্বেষের কারণ বলিয়া বুঝা যায়। যে তাঁহাকে জানে, সেই, রসস্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ বলিয়া তাঁহার অনুরাগী হয়। পরাভক্তি ও পরম জ্ঞান অবিচ্ছেদ্য বলিয়া, যেখানে একটী বর্ত্তমান সেখানে অন্যটীর নিরন্তর অবস্থিতি স্বতঃসিদ্ধ বলিয়া কোন শাস্ত্রে ভক্তি, কোন শাস্ত্রে

একান্ত অনুরাগ জন্মে, তাহার নাম শ্রবণে লোম হর্ষণ হয়। চক্ষে আনন্দাশ্রু বহিতে থাকে। যাহাকে ভালবাসি, তন্নাম-বিশিষ্ট, তদ্বর্ণ বিশিষ্ট, তদ্‌গুণ বিশিষ্ট, তাহার আত্মীয় যে তাহা-কেও ভাল বাসি।

"পক্ষপাতেন তন্নাম্নি মৃগে পদ্মে চ তাদৃশি
বভার মেঘে তদ্বর্ণে বহুমানমতিং নৃপঃ"

নৃসিংহপুরাণ ২৫। ২২।

সে যাহাকে ভাল বাসে, তাহাকে ভাল বাসি, তাহার যে সে যেন আমার। সর্ব্বত্র সকলে তাহাকে দেখি। বিশ্ব-সংসার তন্ময় হইয়া উঠে। প্রেমে বিরহ নাই। সাগর-তরঙ্গ শূন্য নহে। বিরহ সংলিপ্ত প্রেম, তরঙ্গ-শূন্য সাগর, বায়ুশূন্য পৃথিবী অসম্ভব কথা। যাহার বিরহ-কাতর মুখশ্রী দেখিবে, বুঝিবে সে তরুণী। প্রেমের আভাস পাইয়াছে; কিন্তু প্রেমা-মৃতের স্বাদ লাভ ঘটে নাই। শয়নে, স্বপনে, জাগরণে সেই নাম, সেই চিন্তা, সেই ধ্যান; সম্মুখে সে নিত্য মোহন মাধুরী, বিশ্ব তাঁহাতে পরিপূরিত। চাঁদে তাঁহার রূপ, ফুলে তাঁহার কান্তি, মেঘে তাঁহার গম্ভীরতা, বায়ুতে তাঁহার প্রখরতা, জলে তাঁহার কোমলতা, সর্ব্বত্র তাঁহার আবির্ভাব। "যে দিকে ফিরাই আঁখি, কৃষ্ণময় জগৎ দেখি;" তবে বিরহের সম্ভাবনা কোথায়?

যাহাকে ভাল বাসি, তাহার কথায় সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিতে পারি, অন্য কেহ রত্ন দিলেও ভুলি না।

"অপি কীটপতঙ্গো বা ভবেয়ং শঙ্করাজ্ঞয়া
ন তু শক্র ত্বয়া দত্তং ত্রৈলোক্যমপি কাময়ে।"

অনুশাসন পর্ব্ব। ১৪। ৭০। ৭৭

যাহাকে ভালবাসি, আপনাকে তাহার মনের মত করিতে চেষ্টা করি, আর সর্ব্বদা তাহার সঙ্গে থাকিতে বাসনা হয়। কখন "দাসী" হইয়া তাঁহার পদসেবা করি, কখন "সখা" হইয়া তাঁহার সঙ্গে রহস্য আলাপ করি, কখন প্রণয়িনী হইয়া তাঁহাকে মন প্রাণ যথা-সর্ব্বস্ব অঞ্জলি বাঁধিয়া ধরিয়া দিই, যেরূপ তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার হইতেই আমার সুখ। তাঁহার মনোরঞ্জনে আমার জীবন সার্থক হয়, তজ্জন্য গৃহত্যাগ, কুলত্যাগ, দেশত্যাগ অকিঞ্চিৎকর। যাঁহাকে ভালবাসি, সে যদি খড়্গাঘাতে হত্যাকরে, তবুও বলিব "Thy will be done" তুমি যে আমার। ভীষ্মকে বধ করিতে শ্রীকৃষ্ণ খড়্গ হস্তে উপস্থিত, ভক্ত ভীষ্ম আদরে ডাকিতেছেন, আর বলিতেছেন "এস এস তোমার যাহাতে সুখ, তাহাই কর।"

"এহ্যেহি দেবেশ জগন্নিবাস নমোঽস্তু তে শার্ঙ্গগদাসিপাণে।
প্রসহ্য মাং পাতয় লোকনাথ রথাদ্দগ্রাদ্ভুতশৌর্য্য সংখ্যে॥"

ভীষ্ম ৫৮। ২৬০৪

জ্ঞানের ন্যায় ভক্তিও সাধনায় বৃদ্ধ হয়। তন্নাম শ্রবণ ও তন্নাম কীর্ত্তন অনুরাগজনক। নমস্কার বা নিজ অপকর্ষ স্মরণ এবং উপাসনা বা তদীয় উৎকর্ষ চিন্তনে অনুরাগ বৃদ্ধি হয়।

"সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতয়শ্চ দৃঢ়ব্রতা
নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে।
জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতো মুখং।"
তথা "অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহং। গীতা।

অনন্যমনা ও অনন্যরাগ হইয়া, তাঁহার স্বরূপ ধ্যান, ভক্তি সাধনের অন্যতর উপায়।

কিন্তু ইহাদিগের যে কাহারও সিদ্ধি হৃদয়ের পবিত্রতার উপর নির্ভর করে। হৃদয় পবিত্র না হইলে ধ্যানে একাগ্রতা বা কীর্ত্তনে তন্ময়তা জন্মিবার সম্ভাবনা নাই। অপবিত্র হৃদয় ব্যভিচারী, একজনে রমণ করিবার সময় অন্য জনকে স্মরণ করে, না নিজে তৃপ্ত হয়, না অন্যকে তৃপ্ত করে। আর একটী কথা, এই সকল অঙ্গ সাধনে সম্পূর্ণ নিষ্কাম হইতে হইবে। ধন পুত্র সৌভাগ্যাদি সঞ্চয়ার্থ অঙ্গ সাধনে নিয়োজিত হইলে তাহারা তত্তৎ ফলোৎপাদনেই পর্য্যবসিত হইবে—ভক্তি উৎপাদনে সমর্থ হইবে না। এই জন্য সাধন মার্গে স্বর্গ লাভও বাঞ্ছনীয় নহে। স্বর্গ জীবের, মুক্ত যে সে দেবতা; দেবতা প্রেমিক, মনুষ্য ভাবপশু।

---

# অনন্ত তুষানল।

সংসার দুঃখময়। হাহাকার ঘরে ঘরে, জলধারা চোখে চোখে। বৈরাগ্যের নিশ্বাস, বিরহের বেদনা, শোকের ক্রন্দন, রোগের যাতনা, শত্রুর অত্যাচার, দ্রোহীর অবিশ্বাস, প্রণয়ীর বিড়ম্বনা, হতাশের বিষাদ আক্ষেপে সংসার জর জর। মাথার ঘাম ফুটিয়া পায়ে ঝরে, তবুও উদর পূরে না। উষ্ণ শোণিত শীতল হয়, তবু অভাব মিলে না। কাল কেশ সাদা হয়, তবু পিয়াস মিটে না। হা হতাশ, দীর্ঘশ্বাস, হৃদয়বেদনা নিত্য নিরন্তর, তবু লোকে বলে সংসার সুখের, আমার সোণার ঘর-করনা। এ রহস্যের অর্থ কি? সহস্র সহস্র বৎসর পণ্ডিত ও সাধুগণ, বিরাগী ও সন্ন্যাসীগণ, শাস্ত্রকার ও সমাজ-বেত্তা বলিয়া আসিলেন, সংসার অনিত্য, সংসার মায়া, এখনি আছে, এখনি যাইবে, মায়ার মুগ্ধ হইয়া অসার অনিত্য পদার্থকে আমরা নিত্য পদার্থ, সারাৎসার বলিয়া গণনা করিতেছি। কত লোক কত ভাবে কত কথায় আমাদিগকে বুঝাইল। আনন্দ কোলাহলের বাসরে সহসা "হরি বোল হরি" বলিয়া চীৎকারে আমার চমক ভাঙ্গিয়া ক্ষণকালের জন্য চৈতন্য জন্মাইল, স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আবার ইচ্ছা পূর্ব্বক আমি গায়ের বস্ত্র টানিয়া দিয়া নিদ্রার আবেশে ঢুলিয়া পড়িলাম। স্বপ্নই আমার ভাল লাগে, নিদ্রার অজ্ঞানতা আমার বড় প্রিয়, চৈতন্য, আলোক, জ্ঞান, সূক্ষ্মতা, আমাকে আকর্ষণ করে না। লোকে এত বুঝায় তবু যাহা জড়, যাহা অনিত্য, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, যাহা অন্ধকার, যাহা স্থূল, আমি তাহাই ভাল বাসি।

সংসার যে জন্য লোভনীয় বলিয়া লোকে আমাকে বুঝা-

ইত, দেখিয়া ঠেকিয়া শিখিয়াছি, সে সকলই ভুল। যাহা পর্ব্বত বলিয়া ভিত্তি গাঁথিয়া সৌধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলাম, চোরা বালির মত, আমার বিশ্বাসের সেই ভিত্তি দিন দিন পলে পলে সরিয়া যাইতেছে, ঘর ফাটিয়া চুরিয়া গেল, তথাপি মেরামত করিয়া চক্ষু বুজাইয়া বিপদের কোলে মাথা দিয়া পতনোম্মুখ সেই গৃহে শুইয়া আছি। জীবনের শিক্ষা, সাধুর দৃষ্টান্ত, পণ্ডিতের বেদ, সকলেই আমাকে শিখাইয়া দেয়, সংসার অসার কণ্টকপূর্ণ, বেত্রাঘাতে পৃষ্ঠ ফাটিয়া গিয়াছে, আঘাত কত পীড়াদায়ক বুঝিয়াছি, তবু যেখানে আঘাত পাইব, সেইখানেই ছুটি, যেখানে যন্ত্রণা সেখানে মস্তক পাতিয়া দেই, গরল দেখিলেই অমৃত বলিয়া পান করি, এ রহস্যের মর্ম্ম কি?

যাহা পর্ব্বতের ন্যায় দৃঢ় বলিয়া বুঝিয়াছিলাম, তাহা স্বপ্নের ন্যায় বায়ুতে মিশাইয়া যাইতেছে, যাহা আলোকের ন্যায় উজ্জ্বল দেখিতেছিলাম, তাহা অন্ধ হইতে অন্ধতর অন্ধকারে পরিণত হইতেছে, যাহা বরমালা বলিয়া, সোহাগ করিয়া গলায় পরিয়াছিলাম, তাহাই সর্প হইয়া বক্ষে দংশন করিতেছে, তথাপি সেই মালা আবার খুজিতেছি, সেই আলোক আবার চাহিতেছি, সেই স্বপ্নকে সত্য বলিয়া ইচ্ছা পূর্ব্বক ভ্রান্ত হইতেছি, এ স্বেচ্ছাকৃত ভ্রমের কারণ কি? অনিত্যকে নিত্য বলি কেন, অসুখকে সুখ বলি কেন, সাধ করিয়া কণ্টকে দেহ ছিন্ন করি কেন? মরীচিকাকে মরীচিকা বলিয়া বুঝিয়াও তাহার পিছনে দৌড়াই কেন? কে আমাকে বুঝাইবে?

মায়া মোহে কুৎসিত কুরূপকে, সুন্দর সুরূপ বলিয়া কল্পনা করিতেছি। শূন্য হইতে উৎপত্তি, শূন্যের উপাদানে গঠন, বায়ু-ভরে সেই আদিম শূন্যে পরিণত। আমোদের পুত্র কন্যা

শূন্যের সমষ্টি, প্রেমময়ী দয়িতা শূন্যের ছায়া, স্নেহময়ী ভূদেবী জননী জীবন শূন্য স্বপ্নের আবেশ। সাধ করিয়া যাহাকে কোলে লইয়া বসাইতেছি সে পূতি গন্ধময় শব মাত্র, যাহাকে বুকে পুরিয়া বুক জুড়াইতেছি, সেও নাই, আমিও নাই, বুকও নাই, জুড়ায়ও না কেহ. চিন্তা করিতে চক্ষু অবসন্ন হইয়া পড়ে, মস্তিষ্ক মুহ্যমান হয়।

এই সুবাসিত সাধের বেল ফুল, এ নাকি ঘেঁট কুল? এই বায়ু সেবিত, সজ্জিত, শীতল গৃহ, এ নাকি মরুস্থলী? আমার আশার পুত্র, ভরসার-পুত্র, ভরসার ভাই, প্রাণময়ী প্রণয়িনী সকলকে দেখিতে দেখিতে ছাড়িতে হইবে, টানিয়া লইয়া যাইবে, হাত বাড়াইলে ধরিতে পারিব না, কল্পনা কল্পনায় মিশাইবে, শূন্যে শূন্যে কাটিয়া যাইবে, বুঝিতেছি, দেখিতেছি; তবু কেমন বুঝিতে পারি না, মস্তিষ্কে ধরিতে পারি না। হৃদয় মস্তিষ্কের মাথায় একটা ঘোমটা ফেলিয়া মস্তিষ্ককে চাপিয়া ফেলে। মায়ার একটানা স্রোতে আমার হাত পা অবশ করিয়া টানিয়া লইয়া চলিয়াছে, এ মায়ার ব্যাপারটা কি? কিসে আমাকে এত ভ্রান্ত করে, চিতা বাঘিনীকে কেন কুরঙ্গিনী ভাবিয়া পুষিতেছি? এ জটিল রহস্যের মীমাংসা কে করিবে? কে আমাকে বুঝাইবে?

জগৎ অনন্ত মরুস্থলী, সইমুমের ঝটিকা দিবা নিশি অনন্ত বায়ু রাশির উপর প্রবাহিত। কি খর স্রোতা নির্ঝরিণী, কি মন্থরগতি প্রভূতপয়ঃ তুষার বাহিনী, সকলেই সেই স্থলে পতিত হইয়া অন্তর্দ্ধান করে। বিশাল জীবন নদের অবশ্যম্ভাবী এক মাত্র পরিণাম মরুস্থল। প্রারম্ভে খরস্রোত চপলতা, মধ্যে অতুল-স্পর্শ প্রবীণতা, অন্তে আত্মঘাতিনী সরস্বতী মূর্ত্তি, এ

জীবনে লাভ কি? আমি জীবন চাহি না। যে জীবনের ইতিবৃত্ত চিন্তা করিলে আত্মহত্যা পুণ্য বলিয়া প্রতীয়মান হয়, নরক ভোগের তুলনায় স্বর্গ সুখ তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত হয়, আমার অনিচ্ছায় কে আমাকে সে জীবন দান করিয়া উপকৃত করিল?

স্বর্গ, স্বর্গ, স্বর্গ বালকের পুত্তলিকা, বর্ব্বরের প্রলোভন, ইহ জীবনের অসমতা সামঞ্জস্য করিতে প্রতারকের উদ্ভাবনা। ইহ জীবনে যাহা হইল না, পৃথিবীর অনুরূপ উপাদানে সৃষ্ট, অনু-বীক্ষণের কাচ লইয়া ক্ষুদ্র পৃথিবী মহতীকৃত স্বর্গে, পার্থিব নিয়-মের ব্যত্যয় হইয়া, পার্থিব লাভ লোক্‌সানের হিসাব হইয়া ক্ষতি পূরণ করা হইবে। হৃদয় আশ্বস্ত হও। এখানে তোমার পুণ্যের পুরস্কার দারিদ্র্য, পাপের দণ্ড ঐশ্বর্য্য ও সম্ভ্রম। তুমি পাপ হইতে নিবৃত্ত হও। ইহকালে তোমার পুণ্যের পুরস্কার কুঠার, লৌহ শলাকা, জলন্ত চিতা, পাপের দণ্ড রাজ প্রাসাদ। তুমি পাপ হইতে নিবৃত্ত হও। ইহকালে পুণ্যে কিছু লোভনীয় না থাকিলেও পুণ্য কার্য্যে প্রবৃত্ত হও, পরকালে স্বর্গে ক্ষতি পূর্ণ হইবে। হৃদয় আশ্বস্ত হয় না। আমি পাপ করিলাম তোমার বিরুদ্ধে, ক্ষতি করিলাম তোমার, ক্ষমা করিবার ক্ষমতা তোমার, দণ্ড দিতে হয় তুমি দিবে, তোমার অধিস্বামী সমাজ দিবে, সমাজের প্রতিনিধি রাজা দিবে। তৃতীয় ব্যক্তি দণ্ড দিবার কে? ক্ষমা করিবার কে? আমি উপকার করিলাম তোমার, কৃতজ্ঞ হইতে হয়, তুমি হইবে, পুরস্কার দিতে হয়, তুমি দিবে। তৃতীয় ব্যক্তির নিকট পুরস্কার লইব কেন? লইলে তাহাতে তৃপ্ত হইবে কেন? আর যদি পুরস্কার দেন, আর তাহাতে তৃপ্তি হয়, সে পুরস্কার অন্যকে সাধু কর্ম্মে প্রণোদিত

করিতে, তিনিও তোমার সমাজের একজন, সাধারণ তন্ত্রের প্রজা, তোমার সুখ দুঃখে তাঁহার ক্ষতি বৃদ্ধি হয়।

স্থানান্তরে, সময়ান্তরে, সমাজের অসাক্ষাতে, গোপনে দণ্ড পুরস্কার, অন্ধকার রাত্রে দস্যুর লগুড় প্রহারের ন্যায় নিরর্থক বা অপরিচিত, অজ্ঞাত নামার উপহারবৎ পরিত্যজ্য। আমারা সুখ দুঃখ তোমাদিগকে লইয়া। জ্ঞাতি মণ্ডলে অপমান, দেশে সুনাম, যাহাদিগকে লইয়া একত্র আছি, যাহাদিগের শ্রেষ্ঠ হইবার জন্য সকলি পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত, যাহাদিগের একটী টিটকারী, কুঠার অপেক্ষা যন্ত্রণা দায়ক, দণ্ড দিতে হয়, তাহাদিগের সম্মুখে দিবে, পুরস্কার দিতে হয়, তাহাদিগের সমক্ষে দিবে, তবে দণ্ড পুরস্কার সার্থক হইবে।

দণ্ড পুরস্কারে সার্থকতা অস্বীকার করি না। পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে, অস্বীকার করি। যাহা করিয়াছি, তাহার দণ্ড আমাকে ভোগ করিতে হইবে। কাহারও সাধ্য নাই, আমার কৃত পাপের ফল ভোগ হইতে আমাকে অব্যাহতি দিবেন।—কারণ ঘটিলেই সে নিয়মের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না, তবে যে সকল কারণে কার্য্য প্রভাবিত হয়, দণ্ড ভয় বা পুরস্কার লাভ তাহার অন্যদীয় হইয়া কার্য্যকে প্রভাবিত করিতে পারে। তুমি আমাকে দণ্ড দাও, ভবিষ্যৎ অসৎ কার্য্য হইতে আমাকে নিবৃত্ত করিতে, অতীত কার্য্য প্রত্যাহৃত করিতে নহে। অতীত প্রত্যাহরণ করিবার ক্ষমতা আমারও নাই, তোমারও নাই, কাহারও নাই।

তুমি আমাকে পুরস্কার দেও, ভবিষ্যতে সুকার্য্য করিবার লোভ দেখাইতে। দণ্ড পুরস্কারের অন্য কোন অর্থ নাই। ইহ কালের কার্য্যের দণ্ড ইহকালেই হইতে পারে। সমাজের

উপকারের জন্য ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে আমরা বাধ্য হই। দণ্ড সমাজের উপকারার্থ, দণ্ডদাতা সমাজ, পুর-স্কর্ত্তা সমাজ, গ্রামের মোড়ল দিয়াই হউক, সংবাদ পত্রেই হউক, আর দেশের রাজা দিয়াই হউক। শিক্ষা ও সংসর্গের ন্যায়, অনুবৃত্তি ও অভ্যাসের ন্যায়, যে সহস্র কারণে আমার একটী কার্য্য প্রভাবিত করে, দণ্ড পুরস্কার তাহার একটী। শিক্ষাদোষে আচরণ যেমন অন্যায় হইতে পারে, দণ্ডদোষে তেমনি হইতে পারে। সুতরাং দণ্ড পুরস্কারের স্বার্থকতা অস্বীকার করা যাইতে পারে না। কিন্তু সে দণ্ড পুরস্কার পরকালে হয়, দণ্ড পুরস্কার তৃতীয় ব্যক্তির হস্ত গত, তবে সের সিংহের অপরাধে ডালহৌসী দলিপসিংহের দণ্ড করিয়াছিলেন, তাহাও যুক্তিসঙ্গত বলিতে হইবে? আবার তোষামোদ করিয়া বিল্বপত্র দিয়া ভোলানাথকে ভুলাইয়া নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, ইহা অবুদ্ধি কবি কল্পনায় সম্ভব, কিন্তু সত্য নহে। জীবনের সুখ দুঃখের অনিয়মিত অন্যায় বিভাগ দেখিয়া কোন কবি কোন দিন স্বর্গের কল্পনা করিয়াছিলেন। সে কুজ্ঝটিকা যুক্তির আলোকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছে।

দয়াময় ঈশ্বরের রাজ্যে দুঃখ যন্ত্রণার এত প্রাদুর্ভাব কেন? জীবন এত অসার কেন? চিরদিন এই প্রশ্ন চিন্তাশীলের মস্তিষ্ক আলোড়িত করিয়াছে। স্বর্গের ন্যায় আর একটী কবি-কল্পনা মানবেচ্ছার স্বাধীনতা। জগতে দুই জন ঈশ্বর, দুইজন কর্ত্তা, একজন দিয়া প্রহেলিকার সমস্যা হয় না। তাই ঈশ্বর ও শয়তান, দেব ও দৈত্য, সুর ও অসুর, আ-হরিমান ও অহরমজাদারকল্পনা বর্ব্বর-যুগে প্রচলিত ছিল। মনুষ্য এখন সভ্য হইয়াছে, মস্তিষ্কে ব্যাবৃত্তি জন্মিয়াছে, তাই সাকার

দৈত্য, দানব, সয়তান ও অসুরের পরিবর্ত্তে নিরাকার স্বাধীন ইচ্ছাকে তাহাদিগের সিংহাসনে বসাইয়া দিয়াছে। সুখের কর্ত্তা ঈশ্বর, দুঃখের কর্ত্তা মনুষ্যের স্বাধীনতা। দুর্ব্বল ঈশ্বরের অভিপ্রায় ভাল ছিল, তিনি সুখী করিতেই মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, কেবল না বুঝিতে পারিয়া তাহাকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন, সেই স্বাধীনতার দোষে মনুষ্য আপনার পায়ে আপনি কুড়ুল মারিয়াছে। স্বাধীন না হইলে মনুষ্য সুখী হইত, কিন্তু ঈশ্বরের বুদ্ধির দোষেই হউক অথবা হাই-কোর্টের জজিয়তি পাইবার লোভেই হউক, ঈশ্বর মনুষ্যকে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। মার্জ্জার হস্তগত মূষিককে স্বাধীনতা দিলে, মূষিক যখন পলায়নে প্রবৃত্ত হয়, আর মার্জ্জার তাহাকে চপেটাঘাত করে, তখন মার্জ্জারের কত আনন্দ হয়! ঈশ্বর কি সে আনন্দ উপেক্ষা করিতে পারেন? অথবা তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে, তিনি অমৃত ভ্রমে সন্তানকে বিষ পান করাইতেছেন, এখন সন্তানের মৃত্যু হইলে তিনি কি করিবেন? অথবা মনুষ্যকে একটু স্বাধীনতা না দিলে, মনুষ্যের কর্ম্মাকর্ম্মের বিচারপতি হইবার তাঁহার সুবিধা কই ঘটে। সেই জন্যই বা তিনি মনুষ্যকে ইচ্ছার স্বাধীনতা দিয়াছিলেন। দয়া-প্রবণ ঈশ্বর স্ত্রীবৎ কোমল হৃদয়। সামরিক যুগে হৃদয়ের কোমলতা তাদৃশ লোভনীয় নহে, কঠোরতাই সে সময় গৌরবের প্রস্রবণ। তাই কোমল-হৃদয় ঈশ্বরের বিচারে কঠোরতা আরোপ করিবার জন্য লোকে ঈশ্বরকে বিচারক রূপে কল্পনা করিতে চাহিয়াছিল, ঈশ্বরে বিচারপতিত্ব আরোপ করিবার জন্য এবং জীবনের যন্ত্রণা ব্যাখ্যা করিবার জন্য মানব ইচ্ছার স্বাধীনতা কল্পিত হইয়াছিল।

আমার জন্মান্ধতা, আমার মূকতা, আমার অঙ্গ-বৈকল্য যেমন আমার সাধ্যায়ত্ত নহে, আমার কৃত কোন অপকর্ম্মই তেমনি আমার সাধ্যায়ত্ত নহে। যাহারা আমার প্রকৃতি গঠিত করিয়াছে, তাহারা আমার সহিত পরামর্শ করে নাই। আমি যন্ত্র, যন্ত্র যেরূপ গঠিত হয়, সেইরূপে কার্য্য করে, কার্য্য ভাল হয়, সুখ্যাতি কারুকরের, কার্য্য মন্দ হয়, অখ্যাতি কারুকরের।

মন্দ কার্য্যের জন্য, আহাম্মুখ না হইলে কি কেহ যন্ত্রটীকে পদাঘাত করে? যন্ত্রে তৈল দাও, দম দাও, সে অন্য রকমে চলিবে। আমাকেও দণ্ড দাও, পুরস্কার দাও আমি অন্য রকমে চলিব, কিন্তু দায়িত্ব আমার কিছুই নাই। আমার জন্ম, আমার শিক্ষা, আমার সংসর্গ, আমার অভ্যাস, দণ্ড, পুরস্কার, প্রতিবেশী অবস্থান, কিছুই আমার করায়ত্ত নহে। সুতরাং কি করিব, কি না করিব, তাহাতে আমার কোন স্বাধীনতা নাই। যে রকমের কারণ প্রবলতর হইবে, সেই রকমের কার্য্য করিতে আমি বাধ্য। তবে আমার দায়িত্ব কোথায়? তুমি যে দণ্ড দাও তাহা আমার দায়িত্ব হেতু নহে, শত কারণের সঙ্গে আর একটী নূতন কারণ যোগ করিয়া দিবার জন্য। বাতুলকে কোন কার্য্যের দায়ী বলিয়া পদাঘাত করিলে, লোকে তোমাকে যেমন উপহাস করিবে, আমাকে দায়ী বলিয়া পদাঘাত করিলেও তেমনি উপহাস করিবে। যাহা কিছু আমি করি, তাহা আমার প্রাক্তনগত, ললাটলিপি, কর্ম্মফল। আমার ইচ্ছার স্বাধীনতা বিন্দু মাত্র নাই। থাকিলে আমার সুখ দুঃখের কারণ যথাযথরূপে বুঝিতে পারিতাম বটে, কিন্তু ঈশ্বরকে অনীশ্বর করিয়া ফেলিতাম। আমাকে অমৃত বলিয়া গরল খাইতে দিবার জন্য তাঁহাকে অভিসম্পাৎ করিতাম।

তোমার ইচ্ছা তোমার অধীন নহে, তোমার আজ্ঞাবহ গোলাম নহে এই অর্থে ইচ্ছার স্বাধীনতা স্বীকার করা যায়।

জীবনের দুঃখপ্রাবল্য এড়াইবার জন্য দুর্ব্বল প্রকৃতি লোকে আত্মহত্যা করে, ইহা ব্যাখ্যা করিবার জন্য তেমনি প্রাশ্চাত্য ও প্রাচ্য নানা দেশীয় দার্শনিকগণ মানসিক আত্মহত্যা ঘটাইয়াছিলেন। পুত্রশোক নিবারণ করিতে কেহ কেহ সুরা পান করিয়া আত্মবিস্মৃতি ঘটায়, এই জন্য দার্শনিকেরা মায়া পান করিয়া ভববিস্মৃতি ঘটাইয়া ছিলেন। পূর্ব্বে দ্বৈতবাদিদিগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ইহারা সুখের কর্ত্তা এক ঈশ্বর ও দুঃখের কর্ত্তা আর এক ঈশ্বর কল্পনা করিয়া ছিলেন। এই মাতালেরা অদ্বৈতবাদী। ইয়ুরোপে ফিকৃটে ও ভারতবর্ষে শঙ্কর মিশ্র ইহাদের আচার্য্য। ইহাদের ভিন্নপ্রকৃতি সন্তান সন্ততি অনেক আছে। কেহ বলেন, জগতে সুখ ভিন্ন দুঃখ নাই। সকলি সুখের, চাঁদের জোছনা, ফুলের সুবাস, মেঘের শোভা, শিশুর হাসি, প্রণয়ের সুখ, নানা কথার অনুপ্রাস ঘটাইয়া ক্ষত মুখে ভস্মের প্রলেপ দিতে চাহেন। কেহ বা বলেন, দুঃখ বলিয়া যাহা বুঝিতেছ, তাহা দুঃখ নহে, তাহাও সুখ। তুমি মায়ায় পড়িয়া ভ্রান্ত হইয়াছ, তাই ফুলের আঘাতে বজ্রপাত কল্পনা কর, সোণার হারকে লৌহ শৃঙ্খল অনুমান কর, সুখের বাসর দুঃখের কারাগার বলিয়া প্রতীত হয়। এই দলের অগ্রণীগণ সোঽহং ঘোষণা করেন।

"আমিই ঈশ্বর"। কেবল আমার সত্তা ঈশ্বর নহেন, আমি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত নহি, আমিই ঈশ্বর। আর স্রষ্টা নাই, সৃষ্টি নাই, ইহকাল পরকাল নাই, জন্ম নাই, মৃত্যু নাই, স্বর্গ নাই, পৃথিবী নাই, এক ভিন্ন দুই নাই। অহংই ঈশ্বর,

অনাদি অনন্ত, সর্ব্বজ্ঞ, ঈশ্বরই সব, মনুষ্যই সব। অদ্বৈত-বাদিগণ মনুষ্যকে ঈশ্বরত্ব দান করিয়া ঈশ্বরকে অবনত করেন, অথচ দুঃখের কারণ ব্যাখ্যাত হয় না। মনুষ্য ঈশ্বর হইলে পাপ করে কে? দণ্ড পায় কে? ঈশ্বর? মনুষ্য ঈশ্বর হইলেও মনুষ্য-ঈশ্বর দুঃখ ভোগ কেন করে? অব্যাখ্যাতরহিয়া যায়। কেহ বা দুঃখের অস্তিত্ব উড়াইবার জন্য জগতের অস্তিত্ব উড়াইয়া দেন, কেহ বা দুঃখ ভোগীর অস্তিত্ব উড়াইয়া দুঃখের উন্মূলন করিতে চেষ্টা করেন। নির্ব্বোধ শশক পত্রপুঞ্জে মস্তক লুকাইলে কি ব্যাধের বজ্রাঘাত নিবৃত্তহয়?

নিরীশ্বরবাদী শাক্য সিংহ অন্যান্য প্রাচীন পণ্ডিতের ন্যায় অবিদ্যা হইতে বাসনা ও বাসনা হইতে দুঃখের উৎপত্তি অনু-সরণ করিয়া জন্মমাত্র দুঃখের কারণ বলিয়া প্রতিপন্ন করিয়াছিলেন। দুঃখময় জীবনের সৃষ্টি কর্ত্তা ঈশ্বর, ইহা শাক্যসিংহ বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। জীবের দুঃখ ও ঈশ্বরের দয়ার বিসম্বাদিতা তিনি ঘুচাইতে পারেন নাই। কেহ দুঃখের অস্তিত্ব কেহ বা জীবের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া অদ্বৈতবাদী হইয়াছিলেন। কেহ বা উভয় স্বীকার করিয়া দ্বৈত ঈশ্বরের কল্পনা করিয়াছিলেন। এই দুইটীর কোনটী শাক্যের মনঃপূত হয় নাই; তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়া কর্ম্মফল দ্বারা জীবের দুঃখ ব্যাখ্যা করিয়া ছিলেন এবং জগতকে স্বতঃসৃষ্ট বলিয়া অভিহিত করিতেন। কর্ম্মফল বর্ত্তমান দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে; কিন্তু আদিম দুঃখের কারণ ব্যাখ্যা করিতে পারে না। কর্ম্মফল এমন কেন হইল? যাহার পরিণামে আমাদের এত দুঃখ, পূর্ব্ব পুরুষগণ এমন কর্ম্ম কেন করিয়াছিলেন, শাক্য-সিংহ তাহার উত্তর দিতে পারেন নাই। হিন্দু

ব্যবস্থাপকগণ দুঃখময় জীবন বিধবার দুঃখ মোচনের জন্য বাসনার সংযমন, নিবৃত্তি মার্গ বা ব্রহ্মচর্য্য ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শাক্য-সিংহ দুঃখময় জীবন মাত্রেরই জন্য সেই ব্রহ্মচর্য্য বা অনন্ততুষানলের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি সরল ভাবে স্বীকার করিয়াছিলেন, জন্ম বা জীবন মাত্র দুঃখময়,—আত্মহত্যা সে দুঃখ নিবারণের একমাত্র উপায়। বিষ-পানে বা উদ্বন্ধনে এক দিনে আত্মহত্যা করিবার পরামর্শ দিলে লোকে তাঁহাকে বাতুল বলিত। তাহা না করিয়া তিনি এক একটু করিয়া জীবনের শ্বাসরোধ করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন, রিপু, কামনা, বাসনা, হৃদয়, তিনি এক একটু করিয়া তুষানলে দগ্ধ করিতে, এক একটু করিয়া সমস্ত হৃদয়টা উৎপাটিত করিতে বলিয়াছিলেন। হৃদয় দুঃখের কারণ। মাতাল সুরা মধ্যে হৃদয়কে ডুবাইয়া শোক হইতে ক্ষণকালের জন্য নিষ্কৃতি পায়,—সন্ন্যাসী মাদক সেবন করিয়া যন্ত্রনার লাঘব করে। সে কিন্তু ক্ষণিক চিকিৎসা। কর্ম্মফল জীবনে দুঃখের কারণ বলিয়া এবং হৃদয় সেই দুঃখের আধার বলিয়া, বুদ্ধদেব জ্ঞানযোগে হৃদয়কে চিরদিনের মত ধ্বংস করিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। হৃদয়হীন জীবন, মৃত্যু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হয় না। শাক্য বলিয়াছিলেন, জীবনে লাভ নাই। যদি ভবিষ্যতে ক্ষতিপূরণের আশা না রহিল, যদি আমার অনায়ত্ত কারণ হেতু সমস্ত জীবন যন্ত্রণাই পাইতে হইল, যদি অমৃতের কটোরা মুখের নিকট পৌঁছিতে পৌঁছিতে হলাহলেই পরিণত হয়, যদি সংসার কেবল মরুময়, প্রণয় কেবল বিরহময়, মিত্রতা শত্রুতাময়, বিশ্বাস অবিশ্বাসময়, উপকার কৃতঘ্নতাময়, শান্তি অশান্তিময়, ধর্ম্ম প্রতারণাময়, পবিত্রতা কুটিলতাময় হয়, যদি জীবন কেবল

বিষময় হয়, তবে জীবনে লাভ কি? এত দুঃখ যন্ত্রণা পাইয়া এখনও জীব যখন জীবনের আকাঙ্ক্ষা করে, তখন বুঝিলাম বিষপাত্র এখনও পুর্ণ হয় নাই। যে স্তম্ভে তাঁহাদের সুখের লতা জড়াইয়াছেন, যে দিন বালকের হস্তে উর্ণনাভের তন্তুর ন্যায় বজ্রাঘাতে তাঁহাদের সে স্তম্ভ চূর্ণিত হইবে, তখন তাঁহারা দেখিবেন পৃথিবীতে সার কেবল বিষাদ, সুখ স্বপ্নমাত্র। স্বাধীনতা পাপের কারণ নহে, যেহেতু স্বাধীনতা নাই পূর্ব্বেই বলা গিয়াছে। কর্ম্মফলই পাপের কারণ অর্থাৎ আমার পাপের জন্য দায়ী আমি নহি, অন্যেরা! অন্যের পাপ আমাদ্বারা প্রকাশিত হয়। "পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্যলক্ষণং।" দণ্ড আমি পাই কেন? বলিবে আমার এই দণ্ড অনুমান করিয়া পূর্ব্ব পুরুষেরা পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবেন বলিয়া। কৈ তাঁহারাত নিবৃত্ত হন নাই; হইলে আমি পাপ করিতাম না, তোমরাত দণ্ড দিতে না। পক্ষান্তরে দেখ, প্রত্যেক নগরে ওলাউঠা ও বাতশ্লেষ্মা জ্বরের ন্যায় পাপীর নিরন্তর জন্ম হইতেছে। পয়োনালীজাত কীটের ন্যায়, নগরের পঙ্কিল ক্ষেত্রে রাশি রাশি পাপীর জন্ম হইতেছে, কোন দণ্ড পুরস্কারে ইহারা পরিবর্ত্তিত হইবার নহে। ইহাদের জন্ম দাতা কে? সুতরাং জীবনের দুঃখ মাত্র পাপ হেতুও নহে, হইলেও অন্যায়।

আর যে পাপের জন্য দায়ী আমি নহি, তাহার জনিত দুঃখ আমাকে ভোগ করিতে হইলে তোমরা সুবি[illegible]ক বটে! ভাই, যখন কঠোর কুঠারাঘাতে পাপীকে চূর্ণ করিতে উদ্যত হইবে, তাহার বাল্যিত্ব চিন্তা করিয়া তাহার দুর্দ্দশায় এক ফোঁটা চোখের জল অর্পণ করিও।

---

# সময়-ক্রিয়া।

দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার জগতের নিত্য ঘটনা। সারিকা দুর্ব্বল পতঙ্গ বধ করিয়া ভক্ষণ করে, সে কীট লঘুতর কীটাণু বা উদ্ভিদ-জীবী। পক্ষান্তরে সারিকা শ্যেনের ভক্ষ্য, সে শ্যেন আবার ব্যাধের খরশান বাণ প্রহারে হত হয়। আমার কত সাধের আনন্দ-কুটীর ভূকম্পনে ধরাশায়ী হইল, প্রমোদ কুঞ্জ কুজ্‌ঝটিকাঘাতে ছার খার হইল, বনমালা নিদাঘ তাপে শুখাইয়া যাইল। যাহাকে ধন, প্রাণ, মন, বল, যৌবন, স্বাস্থ্য সকলি উৎসর্গ করিয়া লালন-পালন করিলাম, বুকের আঁধার আলো করিবার একমাত্র কোহিনুর, অন্ধের চক্ষু, খঞ্জের যষ্টি, আমার সে সুকুমারকে আমার বুক ছিঁড়িয়া দেবতা লইয়া যাই-লেন! কে বলে দয়ামায়া দেবতার আছে? তুমি বাঙ্গালার সেরাজ উদ্দৌলা, সহরের সাহেব, গ্রামের জমিদার, তোমার ধনবল ও লোকবলের অভাব নাই, আমি দীনহীন দরিদ্র অস-হায়, আমার দশ বিঘা ব্রহ্মত্তর ছিল, তুমি তাহা কাড়িয়া লইলে। আমার ঘরে পতিপ্রাণা প্রেমময়ী ছিল, তোমার দুর্দ্দাম লালসা চরিতার্থ করিতে তুমি আমার মস্তকে লাঠী ও বুকে ছুরিকা আঘাত করিয়া তাহাকে অপহরণ করিলে। আমার সর্ব্বনাশ করিলে। আমি রাজার শরণ লইলাম, রাজা তোমারি সহায় হইলেন। দেবতার ন্যায় মনুষ্য, মনুষ্যের ন্যায় পশু পক্ষী, সকলেই নির্ম্মম, নির্দ্দয়। দুর্ব্বলের উপর প্রবলের অত্যাচার জগতের নিত্য ঘটনা।

যাহা নিত্য ঘটনা, যাহা হইতে অব্যাহতি পাইবার উপায় নাই, তাহাই স্বাভাবিক, তাহাই জগতের নিয়ম বলিয়া প্রতীয়-

মান হয়। বনবাসী আদিম দার্শনিক, যখন বনবাসী বর্ব্বর সমাজে দর্শন-শাস্ত্রের প্রথম বীজ বপন করিয়াছিলেন, প্রতি-বেশী সন্তানগণ অনিবার্য্য দুঃখে প্রপীড়িত হইয়া তাঁহার মুখের দিকে যখন কাতর চক্ষে চাহিয়া থাকিত, তখন ইহাই বলিয়া দার্শনিক-মণ্ডলী তাহাদিগকে সান্ত্বনা দিতেন। আজ সভ্য-সমাজে বসিয়া আমরা যে বড় অধিক শান্তিপ্রদ হৃদয়-গ্রাহী কোন মীমাংসা করিতে সক্ষম হইয়াছি, বোধ হয় না। কপাল বল, কর্ম্মফল বল, স্বভাবের নিয়ম বল, দগ্ধ-হৃদয়ে শান্তি দিতে সকলেই সমান। মানবের অনন্ত নরকভোগ কিছুতেই প্রশমিত হইবার নহে।

সে যাহা হউক, প্রবল দুর্ব্বলের উপর অত্যাচার করিবে, ইহা স্বভাবের নিয়ম বলিয়া নানা বর্ব্বর সমাজে প্রচারিত আছে। অত্যাচার সফল না হইলে, দুর্ব্বলকে মনের সাধ মিটাইয়া যন্ত্রণা দিতে না পারিলেই প্রবলের অনুতাপ। কারণ সে যে প্রবল নহে, অন্ততঃ যত বলবান্ বলিয়া তাহার বিশ্বাস ছিল, সে যে তত বলবান্ নহে, ঈপ্সিত সাধনে বিফলতা তাহার প্রমাণ। এই বিফলতা তাহার সমাজে তাহার নিন্দার কারণ এবং তাহার পদহানির কারণ। সুতরাং যে দুর্ব্বল তাহার মনোবাঞ্ছা বিফল করে, তাহার প্রতি তাহার মর্ম্মান্তিক আক্রোশ রয়, সে জীবনে মরণে, দেশে বিদেশে বনবাসে ও মরুস্থলে, নদীস্রোতে ও সাগরগর্ভে বজ্র হস্তে তাহার অনুসরণ করে।

দুর্ব্বলের নালিশ নাই, কাঁদিবার নাই, ভাবিবার নাই। যদি স্বহস্তে সে অত্যাচারের প্রতিবিধান করিতে পারে, তবেই যাহা হউক। দেবতা হউক, মনুষ্য হউক, আর পশু-পক্ষীই হউক, যদি আপন বলে অত্যাচারীকে দণ্ড দিতে পারিলাম ত

ভাল, নতুবা পড়িয়া পড়িয়া প্রহার সহ্য করিতে হইবে, আর কেহ আমার হইয়া সাহায্য করিবে না, সাহায্য করা দূরে থাকুক, "আহা" বলিয়া কেহ এক ফোঁটা চক্ষের জল ফেলিবে না।

প্রবল-পীড়িত আমি বর্ব্বর সমাজের কুষ্ঠরোগী। অত্যাচারী দেবতাকে শাসন করিতে আমি, মনুষ্যের উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণ করিতে আমি, শ্বাপদের হিংসা দমন করিতে আমি। অত্যাচার ও প্রতিহিংসা, অসভ্য সমাজের ঐতিহাসিক ঘটনা এই দুইটী মাত্র। বিবাদ কলহ সংগ্রাম তাহার নৈতিক অবস্থা। আপন বল বুঝিতে পারি, অত্যাচারের সহিত প্রতিহিংসার অনুপাত অন্ততঃ সমান রাখিতে পারি, তবে টিকিয়া যাইব, নতুবা সংসারের কুরুক্ষেত্রে আমাকে স্ববংশে নির্ব্বংশ হইতে হইবে, শত্রু হাস্য মুখে আমার মৃতদেহে পদাঘাত করিয়া চলিয়া যাইবে। প্রতিহিংসা, হাতের বদলে হাত, চোখের বদলে চোখ, প্রাণের বদলে প্রাণ, অনন্যসহায়ে, স্বহস্তে, এই অসভ্য সমাজের আইন কানুন! সেখানে ছকুড়ী পাঁচ আইন নাই, জজ নাই, মাজিষ্ট্রেট নাই। তুমিই তোমার সকলি। আপনি আপনাকে রক্ষা করিতে পার, তুমি তোমার মিত্র, না পার, তুমি তোমার শত্রু, আর সকলে তোমার পক্ষে যাহা, তুমিও তোমার পক্ষে তাহা। পুরুষ, স্ত্রী, বালক, বর্ব্বর সমাজে সকলেই প্রতি-হিংসাপ্রিয়, সকলেই সমরপ্রিয়। প্রতিহিংসা সামরিকতার জননী, কাহাকে [illegible]কটী কথা বলিয়া নিষ্কৃতি পাইবার সম্ভাবনা নাই। জীবন থাকিতে এক দিন না এক দিন সে প্রতিশোধ লইবেই লইবে।

প্রথমে স্বহস্তে প্রতিশোধ, তাহার পর পরহস্তে প্রতিনিধির দ্বারা প্রতিশোধ। তোমার হস্তে আমার পিতা হত হইয়াছেন,

তিনি প্রতিশোধ লইতে পারেন নাই, আমি তাঁহার প্রতিশোধ লইব। যত দিন মনুষ্য পশু পক্ষীর ন্যায় প্রত্যেকে স্বতন্ত্র বাস করিত, তত দিন প্রত্যেকে স্বতন্ত্র প্রতিশোধ লইত। সুতরাং শত্রু পরাস্ত, হত বা তাড়িত হইলে প্রতিশোধ পরিসমাপ্ত হইত। যখন মনুষ্য পরিবার লইয়া বাস করিতে শিখিল, তখন অবধি পরিবারের যে কেহ যে কাহারও প্রতিশোধ লইতে আরম্ভ করিল। পরিবারের এক জনের সহিত যাহার বিবাদ, পরিবারের সকলের সহিত তাহার বিবাদ। পরিবারের একজনের অপমানে সকলেই কলঙ্কিত, সুতরাং একটী পরিবার নির্ম্মূল না হইলে প্রতিশোধের শেষ হইত না। এমন অবস্থায় পরিবারের মধ্যে বলবীর্য্যে যে শ্রেষ্ঠ, সেই দরবেরে, তাহারই নিকট প্রতিশোধ প্রত্যাশা করিবার সম্ভাবনা। বিবদমান দুইটী পরিবারের সম্মুখ যুদ্ধে প্রত্যেক পরিবারের সকলে, বাল, বৃদ্ধ, নারী যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হইত। হতভাগ্য কাপুরুষ সে যে পরিবারের কলঙ্ক উপেক্ষা করে। কখন কোনও কারণে বা বিবদমান পরিবারের এক একজন সমস্ত পরিবারের প্রতিনিধিরূপে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইত। সেই প্রতিনিধির পরাজয়ে সমস্ত পরিবার পরাস্ত, তাহার বিজয়ে সকলে গৌরবান্বিত হইত।

প্রতিনিধি প্রথা আরম্ভ হইলে ক্রমে তাহার বিবর্ত্তন আরম্ভ হয়। মিত্র পরিবারের আত্মীয়, এক গোত্র [illegible]ত বিদেশী ক্রমে পরিবারের প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হইতে থাকে। সাধারণতঃ প্রতিশোধকারী পরিবারের কেহ হইলে পরিবার গৌরবান্বিত হয়। সেই গৌরব রক্ষার্থ প্রতিনিধি নির্ব্বাচন প্রধানতঃ পরিবার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। কিন্তু পরিবারে উপযুক্ত লোকের

অভাব হইলে, পরিবারের নিকট আত্মীয় বা মিত্র প্রতিনিধিরূপে নিযুক্ত হয়। ক্রমে বেতনভোগী ভৃত্য পরিবারের হইয়া যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করে। পরিবারের কেহ পরিবারের যুদ্ধ করিলে যত গৌরব হয়, আত্মীয় করিলে তত হয় না। আবার আত্মীয় অপেক্ষা মিত্র হীনতর, এবং ভৃত্য হীনতম প্রতিনিধি। সামরিক প্রবৃত্তি হীনতার লক্ষণ এবং ধন বৃদ্ধির চিহ্ন বেতন ভোগী সৈন্য। যে পরিবার যে জাতি বা যে রাজ্যে বাহুবল যত হীন হয় এবং ধন বল যত বলীয়ান্ হইতে থাকে, সে পরিবার গোত্র বা জাতির বাহিরের লোক লইয়া ততই যুদ্ধ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়।

পরিবার সম্বন্ধে যে নিয়ম, কএকটী পরিবার একত্র হইয়া যখন একটী জাতি গঠিত হয়, তখনও সেই নিয়ম চলিতে থাকে। দুই জাতিতে যুদ্ধ হইলে, এক জাতির সকলে বা তাহাদের প্রতিনিধিগণ যুদ্ধ করে, এবং প্রতিনিধির জয় পরাজয় সমস্ত জাতির জয় পরাজয়রূপে গণ্য হয়। দ্বন্দ্ব যুদ্ধে একজন পরাস্ত হইলে সে যাহাদের প্রতিনিধি, সে জাতির সকলে বিজয়ী জাতির অধীনতা স্বীকার করে। কাল ক্রমে প্রতিনিধির পরিবর্ত্তে বেতনভুক্ত সৈন্য পোষিত হয়, এবং তাহাদিগের তত্ত্বাবধারণার্থ সেনাধ্যক্ষ ও সেনাপতি নিয়োজিত হইয়া থাকে।

যুদ্ধের জয় পরাজয়ে দোষীর দোষ সাব্যস্ত হয়। পরাজয় কেবল শারীরিক দুর্ব্বলতার পরিচায়ক নহে, নৈতিক দুর্ব্বলতারও পরিচায়ক। তুমি দোষী না হইলে যুদ্ধে তুমি পরাস্ত হইবে কেন? বস্তুতঃ বর্ব্বর সমাজে ন্যায় অন্যায়ের অন্য অর্থ নাই। অন্য বিচার নাই। তুমি আমার ক্ষতি করিয়াছ আমি তাহার প্রতিশোধ লইব। পরকালে আর একজন দণ্ড দিবেন, এসব

কূটতার্কিকতা বর্ব্বরহৃদয়ে স্থান পায় না। তুমি আমার ক্ষতি করিয়াছ, আমি তাহা পূরণ করিয়া লইব। ক্ষতি করিয়াছ কি না তাহার প্রমাণ তোমার জয় পরাজয়। তুমি জয়ী হইলে বুঝিব ক্ষতি করিতে তোমার অধিকার ছিল, অথবা তুমি ক্ষতি কর নাই, অন্যে করিয়াছে, পরাজিত হইলে তুমি দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইলে। পরাজয়জনিত তোমার কলঙ্ক কথনও আমার ক্ষতি পূরণ করে,কথনও বা তুমি আজীবন আমার দাসত্ব করিয়া আমার ক্ষতি পূরণ কর। কখন বা অঙ্গের বদলে অঙ্গ, প্রাণের পরিবর্ত্তে প্রাণ হইয়া ক্ষতি পূরণ করা হয়। কথনও বা অঙ্গের বা প্রাণের মূল্য লইয়াও তোমাকে ছাড়িয়া দিতে পারি। এই-রূপে প্রতিশোধ লইয়াই সকল দাবী মিটিয়া যায়, ইহকালে পরকালে আর তুমি আমার নিকট ঋণী রহিলে না। আমার নিকট ভিন্ন আর কাহার নিকট তোমার জবাব দিহী করিতে হয় না। সমাজ বা সমাজের প্রতিনিধি রাজার নিকট দোষী ব্যক্তি অপরাধী, অপরাধ ব্যক্তিগত নহে সমাজগত, এ চিন্তা সভ্য সমাজোচিত। আমার নিকট তুমি দোষ করিয়াছ আমার সঙ্গে তোমার হিসাব, আমি যে প্রকারে পারি সে হিসাব মিটাইব, অন্যের তাহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। আমার সঙ্গে হিসাব মিটিলেই হইল। আমার নিকট অপরাধ করিলে, তুমি আর কাহার নিকটে হিসাব দিতে বাধ্য নহ, ইহাই বর্ব্বর সমাজের নিয়ম। ক্রমে এই আমি আমার পরিবারে, পরিবার জাতিতে, জাতি সমাজে পরিণত হয়। তখন আমি তোমাকে ক্ষমা করিলেও সমাজ তোমাকে ছাড়ে না। রাজা তোমাকে দণ্ড দেন। প্রথমে অঙ্গের পরিবর্ত্তে অঙ্গ লইতাম, তাহার পর মূল্য লইতাম, এখন তাহাই জরিমানারূপে সমাজের প্রতিনিধি

রাজার নিকটে দিতে হয়। প্রাচীন দাসত্ব এখন কারাবাসে পরিণত হইয়াছে।

প্রাচীন কালে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে ন্যায়ান্যায়ের বিচার হইত, যে হারিত সেই দোষী বলিয়া গণ্য হইত। দ্বন্দ্ব যুদ্ধের পরিবর্ত্তে সময়-ক্রিয়া, দিব্য, মহা পরীক্ষা বা Ordeal দ্বারাও এক সময়ে সকল দেশে ন্যায় অন্যায় নির্দ্দিষ্ট হইত। বস্তুত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ এক প্রকার সময়-ক্রিয়া মাত্র। প্রথমে প্রবলতা ন্যায়ের পরিচায়ক ও দুর্ব্বলতা অন্যায়ের নিদর্শক বলিয়া গণ্য হইত। এখন ন্যায়ই প্রবলতার এবং অন্যায়ই দুর্ব্বলতার কারণ বলিয়া গণ্য হয়। তুমি দুর্ব্বল হইলেও ন্যায়ের সাহায্যে তুমি বলবানকে পরাস্ত করিতে পার। অপেক্ষাকৃত সভ্যতর সমাজে এই কারণেই ন্যায়ান্যায়ের বিচার দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নিষ্পন্ন হইত। আবার ন্যায় সাহায্যে দুর্ব্বল যদি প্রবলকে পরাভূত করিতে পারে, স্বভাবের নিয়ম বিপর্য্যস্ত করিতে পারে, তবে ন্যায় বলে স্বভাবের অন্যান্য নিয়ম কেন বিপর্য্যস্ত করা যাইবে না? অগ্নিতে দাহ করে, ইহা স্বাভাবিক নিয়ম, কিন্তু ন্যায়ের সাহায্যে আমি ইহারও ব্যতিক্রম করিতে পারি, ধর্ম্ম কি প্রাকৃত নিয়ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নহে? এরূপ যুক্তি আমরা এখন উপেক্ষা করিতে পারি, কিন্তু এক সময়ে অপেক্ষাকৃত সভ্য সমাজেও এইরূপ যুক্তি হেতু সময়-ক্রিয়া বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সভ্য সমাজে সাক্ষ্য লইয়া বিচার নিষ্পন্ন হয়। কিন্তু অনেক অপরাধ আছে যাহার সাক্ষ্য মিলে না। সভ্য সমাজে তাহাদিগকে নিষ্কৃতি দিতে হয়। একশতজন অপরাধী নিষ্কৃতি পায় সেও ভাল, একজন নিরপরাধীর দণ্ড না হয়, ইহা সহৃদয় সভ্য সমাজের নিয়ম। যেখানে সাক্ষ্য মিলিত না, পূর্ব্বে সভ্যতর জাতির মধ্যেও

সময়-ক্রিয়া দ্বারা সে সকল মোকদ্দমার বিচার হইত। তখন বিশ্বাস ছিল, দেবতা মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া থাকেন। সুতরাং তিনি দোষী নির্ব্বাচনে সাহায্য করিবেন বলিয়া সকলে আশা করিত। যখন শিক্ষাগুণে রাজবিচারে সময়-ক্রিয়া উপেক্ষিত হয় তখনও সাধারণের মন হইতে উহার প্রভাব তিরোহিত হয় না। ইংলণ্ডে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মহা পরীক্ষা রাজ দরবার হইতে দূরীভূত হইয়াছিল, কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীতেও সাধারণ লোক সময়-ক্রিয়া দ্বারা ডাকিনী প্রেতিনী নির্ণয় করিত। উনবিংশ শতাব্দীতেও ইংলণ্ডে ও ইংলণ্ডের ন্যায় সভ্যতাভিমানী য়ুরোপীয় অন্যান্য দেশে মহাপরীক্ষার নিদর্শন পাওয়া যায়।

অতি প্রাচীন কালে য়িহুদী জাতির মধ্যে কোন রমণীকে ব্যভিচারিণী বলিয়া সন্দেহ করিলে তাহাকে মন্ত্রপূত জল পান করান হইত, গোল্ড কোষ্টবাসী অসভ্যদিগের মধ্যে এই প্রথা অদ্যাবধি প্রচলিত আছে। টাসিটাস বলেন, পূর্ব্বে জর্ম্মণ-দিগের মধ্যে মহাপরীক্ষা বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। সাক্-সন জাতি অগ্নিপরীক্ষা বা জল পরীক্ষা দ্বারা দোষী নির্দ্দোষী নির্ণয় করিত। অগ্নি পরীক্ষা উচ্চ শ্রেণীতে ( Freemen) এবং জল পরীক্ষা নিম্ন শ্রেণীতে ( Villain ) আবদ্ধ ছিল। দোষী ব্যক্তি পরীক্ষা দিবার জন্য আবশ্যক হইলে প্রতিনিধি নিযুক্ত করিতে পারিত। কিন্তু পরীক্ষার ফলাফল তাহাকেই ভোগ করিতে হইত। কিছু পয়সা পাইয়া বা বন্ধুতা করিয়া প্রতিনিধি পরীক্ষা দিবার জন্য কিছু শারীরিক কষ্ট মাত্র সহ্য করিত। অগ্নি পরীক্ষার দুইটী প্রণালী ছিল। আধ সের এক সের বা দেড়সের অগ্নিপ্রায় উত্তপ্ত লৌহ হাতে তুলিয়া লইলে যদি

হাতে কোন ক্ষত না হইত, অথবা অগ্নিপ্রায় উত্তপ্ত নয়খানি লাঙ্গলের অর দূরে দূরে লম্বভাবে সাজাইয়া চোখে কাপড় বাঁধিয়া রিক্তপদে তাহাদের উপর দিয়া চলিয়া যাইলে পায়ে যদি কোন ক্ষত না হইত তবে পরীক্ষিত ব্যক্তি নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। ইংলণ্ডের রাজা এডবার্ড কনৃফেসারের জননী রাণী এমা বিশপ আল্‌ইনের সহিত ব্যভিচার করিয়াছে বলিয়া লোকে সন্দেহ করিলে রাজমাতা এই দ্বিতীয় প্রণালীতে অগ্নি পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাজা দ্বিতীয় বিলিয়ামের রাজত্বকালে হরিণচুরি অপরাধে পঞ্চাশ জন লোককে অগ্নি দ্বারা পরীক্ষা করা হইয়াছিল। অগ্নি পরীক্ষার ন্যায় জল পরীক্ষাও দুই প্রকার ছিল। কেহ উত্তপ্ত জলে হাত ডুবাইলে হাতে ক্ষত না হইলে নির্দ্দোষিতা প্রমাণ হইত। কাহাকে বা পুকুরে বা নদীতে ফেলিয়া দেওয়া হইত। সাঁতার না দিয়া সে ব্যক্তি জলের উপর ভাসিয়া উঠিলে তাহাকে দোষী বলিয়া দণ্ড দেওয়া হইত। জলে ডুবিয়া যাইলে নির্দ্দোষিতার সন্দেহ থাকিত না। আরল গড্‌বিন্‌ রাজা এডবার্ডের ভ্রাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন বলিয়া সন্দেহ হইলে আধ ছটাক ওজনের এক খণ্ড মন্ত্রপূতরুটী তাঁহাকে খাইবার জন্য দেওয়া হইয়াছিল। রুটী খানি না চিবাইয়া গিলিয়া ফেলিতে হইত। রুটী খানি গলায় বাধিয়া গডবিনের মৃত্যু হয়। সুতরাং তিনি যে প্রকৃত অপরাধী, সে বিষয়ে কাহারও আর সন্দেহ ছিল না। খাইবার সময় যদি শরীর কাঁপিত বা মুখ বিবর্ণ হইত, তাহা হইলেও তাহাকে দোষী বলিয়া স্থির করা হইত। নর্ম্মানেরা ইংলণ্ড অধিকার করিবার পর দোষী নির্দ্দোষী বা অপরাধী ও অনধিকারী দ্বন্দ্ব যুদ্ধে নির্ণয় করিবার প্রথা আরম্ভ হইয়াছিল।

এতদ্ভিন্ন হতদেহ স্পর্শ করিয়াও নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিবার উপায় ছিল। হত্যাকারী হতদেহ স্পর্শ করিলে তাহা হইতে রক্তস্রাব হইত। ফরাসী দেশে ক্রশের সম্মুখে প্রতিদ্বন্দ্বি-দিগকে দাঁড় করাইয়া রাখা হইত। যে আগে পড়িয়া যাইত, সেই দোষী বলিয়া স্থির হইত। এদেশে পাশা ফেলিয়াও দোষী নির্দ্দোষী ঠিক করা হইত।

সভ্যতাভিমানী গ্রীস দেশেও সভ্যাসভ্য সকল দেশের ন্যায় সময়-ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। বিদ্রোহাপবাদে লোকে তপ্ত লৌহ হাতে লইয়া বা আগুনের উপর দিয়া চলিয়া যাইয়া আপন আপন নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিত। বিথিনিয়া, সার্ডেনিয়া প্রভৃতি য়ুরোপীয় অনেক প্রদেশে জল পরীক্ষার নিদর্শন পাওয়া যায়। শ্যাম দেশে অগ্নি পরীক্ষা, জল পরীক্ষা বা ব্যাঘ্রের সহিত দ্বন্দ্ব যুদ্ধ করিয়া নির্দ্দোষিতা প্রতিপাদন করিতে হইত।

লিবিংষ্টোন্ সাহেব দেখিয়াছেন, আফ্রিকা মহাদেশে কোন পত্নী ঔষধ করিয়াছে বলিয়া কেহ সন্দেহ করিলে ওঝা ডাকাইয়া পত্নীগণকে মাঠে লইয়া যায়, এবং উপবাস করাইয়া রাখে। অবশেষে ওঝা এক প্রকার গাছের রস সকলকে খাও-য়াইয়া দেয়। রস খাইয়া সকলে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া দাঁড়াইয়া থাকে। সে রস খাইয়া যাহারা বমন করে তাহারা নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হয়, কিন্তু যাহাদের উদরাময় হয় তাহাদিগকে ডাকিনী বলিয়া জ্বলন্ত অনলে জীবন্ত দগ্ধ করা হয়। জাম্বে জীতটবাসী নিগ্রোদিগের মধ্যে সময়-ক্রিয়ার বহুল প্রাদুর্ভাব। অতি সামান্য কলহে রমণীরা সময়-ক্রিয়া দ্বারা নির্দ্দোষিতা প্রতিপন্ন করিতে আগ্রহ প্রকাশ করে। বারুসী জাতি কুকুর বা কুক্কুটকে বৃক্ষের নির্য্যাস খাওয়াইয়া দোষাদোষের বিচার

করে। বমনে নির্দ্দোষ ও উদরাময়ে দোষের প্রমাণ হয়!

ভারতবর্ষে কতদিন সময়-ক্রিয়া প্রচলিত আছে, হিসাব করিয়া বলা যায় না। যে অলিখিত ইতিবৃত্ত দীর্ঘায়তন লাভ করিয়া পুরাণ আখ্যায়িকা রূপে দর্শন দেয়, তাহার মধ্যে সময়-ক্রিয়ার বিবিধ উদাহরণ পাওয়া যায়। ব্যভিচার সন্দেহে সীতার অগ্নি-পরীক্ষার কথা সকলেই অবগত আছেন। মনু-সংহিতায় বৎস ঋষি অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া লিখিত আছে। ভারত-বর্ষীয় অনার্য্য জাতির মধ্যে এই প্রথার অদ্যাপি অক্ষত প্রাদুর্ভাব।

গ্যারো পর্ব্বতবাসিদিগের মধ্যে মোকদ্দমা আদৌ হয় না। তাহারা স্বীয় পদ্ধতি অনুসারে সকল গোলযোগ মিটাইয়া লয়। কেহ কাহার নিকট টাকার দাবী করিলে তাহারা একটী নূতন হাঁড়ী ভরিয়া আগুন করিয়া আগুনের উপর জল রাখে, সেই জল নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে ফুটিলে টাকার দায়ী হইতে হয় না। তবে যে মিথ্যা দাবী করে, তাহার অর্থদণ্ড হয়।

আর্য্যসমাজে অতি প্রাচীনকাল হইতে নয় প্রকার দিব্য বা সময়-ক্রিয়া প্রচলিত ছিল। বৃহস্পতি বলেন;—

"ধটোঽগ্নিরুদকঞ্চৈব বিষং কোষশ্চ পঞ্চমং।
ষষ্ঠঞ্চ তণ্ডুলং প্রোক্তং সপ্তমং তপ্তমাষকং।
অষ্টমং ফাল মিত্যুক্তং নবমং ধর্ম্মজং স্মৃতং।
দিব্যান্যেতানি সর্ব্বাণি নির্দ্দিষ্টানি সয়ম্ভুবা॥

বিষ্ণু ধট অগ্নি উদক বিষ ও কোষ, এই পাঁচ প্রকার সময়-ক্রিয়ার উল্লেখ করিয়াছেন। বোধ হয় অপর চারিটী এবং তিল দুর্ব্বাদি অন্যান্য আরো অনেক গুলি সামান্য বা সাধারণ বলিয়া তিনি তাহাদিগের উল্লেখ করেন নাই;—

"তুলাগ্ন্যাপোবিষং কোষাদিব্যানিহ বিশুদ্ধয়ে,
মহাভিযোগেস্বেতানি শীর্ষকস্থেঽভিযোক্তরি"।

কাত্যায়ণ সপ্তবিধ দিব্যের উল্লেখ করিয়াছেন,—

"বিষে তোয়ে হুতাশে চ তুলা কোষে চ তণ্ডুলে,
তপ্তমাষকদিব্যেং চ ক্রমাদ্দণ্ডং প্রকল্পয়েৎ"

ধট বা তুলা পরীক্ষার প্রক্রিয়া এইরূপ ;—

চারি হস্ত উচ্চ দুটী খুটীর উপর খদির বা তিন্দুক কাষ্ঠের পাঁচ হাত লম্বা পতাকাধ্বজ শোভিত তুলা দণ্ড বসাইয়া তাহার দুই পার্শ্বে লৌহ বলয়ে সমান লম্বা দুইটী শিকা ঝুলাইয়া একটীতে অপরাধীকে বসাইয়া ওজন করিয়া লইবে। তাহার পর তাহাকে নামাইয়া প্রাড়্বিপাক ধট ও পরীক্ষকদিগকে এইরূপ সম্বোধন করিবেন ;—

"ব্রহ্মঘ্নাঃ যে স্মৃতা লোকাঃ যে লোকাঃ কূটসাক্ষিণঃ,
তুলাধারস্য তে লোকাস্তুলাং ধাবয়তো মৃষা।
ধর্ম্মপর্য্যায়বচনৈর্ধট ইত্যভিধীয়সে,
ত্বমেব ধট জানীষে ন বিদুর্য্যানি মানুষাঃ।
ব্যবহারাভিশপ্তোঽয়ং মানুষস্তুল্যতে ত্বয়ি,
তদেনং সংশয়াকর্ম্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি।"

অপরাধী তখন এই বলিয়া ধটকে সম্বোধন করিবে ;

ত্বং তুলে সত্যধামাসি পুরাদেবৈর্বিনির্ম্মিতা,
ত্বং সত্যং বদ কল্যাণি সংশয়াস্মাৎ বিমোচয়—
যদ্যস্মি পাপকৃম্মাতস্ততো মাং ত্বং অধোনয়
শুদ্ধশ্চেদ্গময়োর্দ্ধ্বাং মাং তুলামিত্যভিমন্ত্রয়েৎ।

তদনন্তর পুনর্ব্বার অপরাধীকে তুলাদণ্ডে বসাইয়া ওজন করিবে। যদি অপরাধী পূর্ব্বাপেক্ষা লঘুতর হয়, তাহাকে

শুদ্ধ বলিয়া জানিবে, পূর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর হইলে দোষী জানিয়া দণ্ড দিবে। এখানে একটী কথা বলিতে ইচ্ছা হয়। ভারতবর্ষে লঘুতা নির্দ্দোষিতার প্রমাণ। গ্রীস দেশেও লঘুতা নির্দ্দোষিতার প্রমাণ বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু ইংলণ্ডে লঘুতা দোষের প্রমাণ। ইদনোদ্যানে আদি পুরুষকে পাপ পথে প্রবৃত্ত করিবার সময় শয়তান ধরা পড়িলে গাব্রেলের সহিত বিবাদ হইবার উপক্রম হয়। সহসা আকাশ পথে একটী তুলাদণ্ডের আবির্ভাব হইল। সে দণ্ডের এক পার্শ্বে গাব্রেলের প্রতিমূর্ত্তি অবস্থিত, তুলাদণ্ডে আপনাকে লঘুতর পরিমিত হইতে দেখিয়া শয়তান রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিয়াছিল।

অগ্নিপরীক্ষা—

ষোড়শাঙ্গুলং মণ্ডলং তাবদন্তরং সপ্তকং কুর্য্যাৎ। ততঃ প্রাঙ্মুখস্য প্রসারিতভুজদ্বয়স্য সপ্তাশ্বত্থপত্রাণি করয়োর্দদ্যাৎ। তানি চ করদ্বয়সহিতানি সূত্রেণ বেষ্টয়েৎ। ততস্তত্রাগ্নিবর্ণলৌহপিণ্ডং পঞ্চাশপলিকং সমং ন্যসেৎ। তমাদায় নাতিদ্রুতং নাতিবিলম্বিতং মণ্ডলেষু পদন্যাসং কুর্ব্বন ব্রজেৎ। ততঃ সপ্তমং মণ্ডলমতীত্য ভূমৌ লৌহপিণ্ডং জহ্যাৎ।

যো হস্তয়োঃ কচিদগ্নস্তমশুদ্ধং বিনির্দ্দিশেৎ
ন দগ্ধঃ সর্ব্বথা যস্ত স বিশুদ্ধো ভবেন্নরঃ॥

ষোড়শাঙ্গুল ব্যাস পরিমিত সাতটী বৃত্ত সমদূরে অঙ্কিত করিবে, ও অভিশপ্তকে পূর্ব্ব মুখে বসাইয়া হাত বিস্তৃত করিয়া দুই হাতের ভিতর সাতটী অশ্বত্থ পত্র রাখিয়া সুতা দিয়া হাত জড়াইয়া পঞ্চাশ পলিকভার অগ্নিপ্রায় লৌহপিণ্ড রাখিবে। সেই পিণ্ড লইয়া অভিশপ্ত ধীরে ধীরে সেই

সাতটী বৃত্তে পদক্ষেপ করিয়া চলিয়া যাইবে, এবং সপ্তম বৃত্তকে অতিক্রম করিয়া লৌহপিণ্ড মাটিতে রাখিয়া দিবে। যাহার হাত কিছুমাত্র দগ্ধ হইবে, সে দোষী, অন্যথা সম্পূর্ণ নির্দ্দোষী।

•লৌহপিণ্ড গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে অভিশপ্ত ব্যক্তি অগ্নিকে এই বলিয়া সম্বোধন করিবে।—

ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং করে মম

যাজ্ঞবল্ক্য।

উদক পরীক্ষা—পঙ্ক শৈবাল দুষ্টগ্রাহ মৎস্য জলৌকাদি বর্জ্জিত জলাশয়কে এই বলিয়া সম্বোধন করিবে—

ত্বমম্ভসর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ
ত্বমেবাম্ভো বিজানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ।
ব্যবহারাভিশপ্তোঽয়ং মানুষস্ত্বয়ি মজ্জতি
তদেনং সংশয়াদ্ধর্ম্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি।

তদনন্তর অভিশপ্ত ব্যক্তি রাগদ্বেষবর্জ্জিত কোন পুরুষের জানুদ্বয় ধারা করিয়া "সত্যেন মাভিরক্ষস্ব বরুণ" বলিয়া জলে ডুবিয়া থাকিবে। সেই সময় এক জন নাতিক্রূর মৃদু-ধনু দ্বারা (সাত শত অঙ্গুলি পরিমাণ ধনু ক্রূর পঞ্চাশত পরিমাণে মৃদু) একটী তীর নিক্ষেপ করিবে, অন্য একজন দ্রুত যাইয়া সেইটী কুড়াইয়া আনিবে।

তন্মধ্যে যো ন দৃশ্যতে স শুদ্ধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ অন্যথা ত্ববিশুদ্ধঃ স্যাদেকাঙ্গস্যাপি দর্শনে

বিষ পরীক্ষা;—

বিষত্ববিষমত্বাচ্চ ক্রূরং ত্বং সর্ব্বদেহিনাং,

ত্বমেব বিষ জানীষে ন বিদুর্যানি মানুষাঃ।
ব্যবহারাভিশপ্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি
তদেনং সংশয়াদ্ধর্ম্মাদ্ধর্ম্মতঃ ত্রাতুমর্হসি।

এই বলিয়া হিমাচলোদ্ভব শৃঙ্গি বৃক্ষজাত সাতযব বিষ ঘৃত-প্লুত করিয়া অভিশপ্ত ব্যক্তিকে খাইতে দিবে। অভিশপ্ত এই বলিয়া প্রার্থনা করিবে।

ত্বং বিষ ব্রাহ্মণপুত্রঃ সত্যধর্ম্মে ব্যবস্থিতঃ,
ত্রায়স্বাস্মাদভিশাপাৎ সত্যেন ভব মেঽমৃতঃ।

বেগ বিনা যে সে বিষ জীর্ণ করিতে পারিবে, তাহাকে নির্দ্দোষী বলিয়া জানিবে।

কোষ পরীক্ষা—

দুর্গাদি উগ্রদেবতাদিগকে অর্চ্চনা করিয়া তাহাদিগের স্নান-পূত তিন প্রসৃতি জল পান করিবে। দুই তিন সপ্তাহে যদি রোগ অগ্নি জ্ঞাতি মরণ রাজাতঙ্ক প্রভৃতি কোন ব্যসন না ঘটে তবে অভিশপ্ত ব্যক্তি নির্দ্দোষী বলিয়া জানিবে।

দুর্গায়াঃ স্নাপয়েচ্ছূলমাদিত্যস্য চ মণ্ডলং
অন্যেষামপি দেবানাং স্নাপয়েদায়ুধানি চ।

কাত্যায়ন।

তণ্ডুলপরীক্ষা—

আদিত্যস্নানপূত জল ও চাউল একটী মৃণ্ময় পাত্রে এক রাত্রি রাখিয়া চৌর্য্যাভিশপ্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বমুখে বসাইয়া তাহার শিরোপরি এক খানি পত্র রাখিবে। পত্রে এই কথাটী লেখা থাকিবে ;—

আদিত্যচন্দ্রাবনিলোঽনলশ্চ
দ্যৌর্ভূমিরাপো হৃদয়ং যমশ্চ।

অহশ্চ রাত্রিচ উভে চ সন্ধ্যে।
ধর্ম্মো হি জানাতি নরস্য বৃত্তং।

তদনন্তর তাহাকে ঐ তণ্ডুল ভক্ষণ করাইয়া ভূর্জ্জ বা পিপ্পল পত্রে তিনি বার নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করাইবে। শোণিত দৃষ্ট হইলে, হস্ত-তালু বা গাত্র কম্পন হইলে তাহাকে অপরাধী বলিয়া জানিবে।

চাল পড়া খাওয়ান ভারতবর্ষেও অদ্যাপি বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। হণ্টার সাহেব বলেন, ভারত-বর্ষীয় নানা অনার্য্য জাতির মধ্যেও এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। চট্ট-গ্রামের চক্‌মা জাতির কথা বলিতে বলিতে তিনি বলিয়াছেন, "গুরুতর অপরাধে কেহ অভিশপ্ত হইলে একটী মৃণ্ময় পাত্রে এক সের চাউল রাখিয়া পাত্রটী কোন মন্দিরে, গৌতমের প্রতিমূর্ত্তি সমক্ষে রাত্রিকালে রাখিয়া দেওয়া হয়। প্রভাতে মণ্ডলেরা অভিশপ্ত ব্যক্তিকে তাহার কিছু চিবাইতে দেয়। অপরাধী হইলে চাল চিবান দুষ্কর হইয়া পড়ে এবং তাহার মুখ দিয়া রক্ত উঠিতে থাকে।

With slight modification this form of ordeal prevails in every part of India,

Hunter s Statistical
Reports,

তপ্ত মাষক—ষোড়শাঙ্গুল দীর্ঘ চতুরঙ্গুল খাত মৃণ্ময় তাম্র বা আয়স পাত্র বিংশতি পল পরিমাণে উত্তপ্ত ঘৃত বা তৈল দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে সুবর্ণ মাষক নিক্ষেপ করিবে। অভিশপ্ত ব্যক্তি অঙ্গুষ্ঠাঙ্গুলের যোগে তাহা উদ্ধার করিবে। করাগ্রে যদি ক্ষত বা বিস্ফোটক না হয় তাহাকে শুদ্ধ

বলিয়া জানিবে। বিচারক ঘৃতকে এই বলিয়া আহ্বান করিবেন।

পরং পবিত্রমমৃতং ঘৃতং ত্বং যজ্ঞকর্ম্মসু
সহ পাঠক পাপং ত্বং হিম শীতঃ শুভেতর।

অভিশপ্ত এই মন্ত্রটী পাঠ করিবেন।

ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি পাবক
সাক্ষিবৎ পুণ্যপাপেভ্যো ব্রূহি সত্যং করে মম।

ফালপরীক্ষা—

গো-চোরদিগের পক্ষে ফাল পরীক্ষা বিধেয়। দ্বাদশ পল অষ্টাঙ্গুল দীর্ঘ ও চতুরঙ্গুল বিস্তার ফাল প্রস্তুত করিয়া তাহা উত্তাপে অগ্নিবর্ণ করিবে। তদনন্তর নিম্ন লিখিত মন্ত্রে অগ্নিকে আরাধনা করিয়া চোরকে সেই ফাল জিহ্বা দ্বারা লেহন করিতে বলিবে। জিহ্বা দগ্ধ না হইলে সে নির্দ্দোষী।

ত্বমগ্নে বেদাশ্চত্বারস্ত্বঞ্চ যজ্ঞেষু হূয়সে
ত্বং মুখং সর্ব্বদেবানাং ত্বং মুখং ব্রহ্মবাদিনাং
জঠরস্থোঽসি ভূতানাং ততো বেৎসি শুভাশুভং
পাপং পুনাসি বৈ যস্মাত্তস্মাৎ পাবক উচ্যতে।
পাপেষু দর্শয়াত্মানমর্চ্চিষ্মান ভব পাবক
অথবা শুভভাবেন শীতো ভব হুতাশন
ত্বমগ্নে সর্ব্বভূতানামন্তশ্চরসি সাক্ষিবৎ
ত্বমেব দেব জানীষে ন বিদুর্য্যানি মানবাঃ
ব্যবহারাভিশপ্তোঽয়ং মানুষঃ শুদ্ধিমিচ্ছতি
তদেনং সংশয়াদস্মাদ্ধর্ম্মতস্ত্রাতুমর্হসি। নারদ

সাক্ষীর অভাবে অনেক সময়ে ব্যভিচার চৌর্য্য অগম্যাগম রাজদ্রোহ প্রভৃতি মহাপাতকের যথার্থ বিচার হয় না। সাক্ষী

মিলিলেও তাহারা সকল সময়ে সত্য কথা বলে না। কিন্তু দৈবপরীক্ষায় ভ্রম হইবার সম্ভাবনা নাই। এইরূপ ভাবিয়া দৈবপরায়ণ লোকে অনেক সময়ে এই সকল মোকদ্দমায় সময়-ক্রিয়ার অনুসরণ করে।

• স্নেহাৎ ক্রোধাল্লোভতো বা ভেদ আয়ান্তি সাক্ষিণঃ।
বিধিদিষ্টস্য দিব্যস্য ন ভেদো জায়তে ক্বচিৎ ॥

আবার শীত বাতে পাছে পরীক্ষার ব্যতিক্রম ঘটে, এজন্য বিধান করা হইয়াছিল ;—

চৈত্রমার্গশিরশ্চৈব বৈশাখশ্চ তথৈব হি।
এতে সাধারণা মাসাঃ দিব্যানামবিরোধিনঃ।
ন শীতে তোয়শুদ্ধিঃ স্যান্নোষ্ণকালেঽগ্নিশোধনং।
ন প্রাবৃষি বিষং দদ্যাৎ প্রবাতে ন তন্তু নৃপাঃ
পূর্ব্বাহ্লে ন নরদিব্যানাং প্রদানং পরিকীর্ত্তিতং
নাপরাহ্লে ন সন্ধ্যায়াং ন মধ্যাহ্নে কদাচন।

কোষ তণ্ডুলাদি পরীক্ষা সকল কালে হইতে পারিত। পূর্ব্বে বলা গিয়াছে ইংলণ্ডের উচ্চ শ্রেণীর জন্য অগ্নি পরীক্ষা ও নিম্ন শ্রেনীর জন্য কোষ পরীক্ষা বিহিত ছিল। ভারতবর্ষেও সেইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণস্য ধটো দেয়ঃ ক্ষত্রিয়স্য হুতাশনঃ।
বৈশ্যস্য সলিলং দেয়ং শূদ্রস্য বিষমেব তু ॥

বৃদ্ধ আতুর ও রমনীগণের জন্য মহাপরীক্ষা বিহিত নহে। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়মের বিপর্য্যয়ে অসম্ভব সম্ভাবনা অদৈব-পরায়ণ ঊনবিংশ শতাব্দীর লোকে বিশ্বাস করিবে কি?

অগ্ন্যাদি পরীক্ষায় নির্দ্দোষী ব্যক্তিও কি কখন নিষ্কৃতি পাইত? স্বতঃই এ প্রশ্ন মনে উদিত হয়। ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে

বারাণসীর প্রধান মাজিষ্টেট আলি ইব্রাহিম খাঁর সমক্ষে মিতাক্ষরা মতে কএক জন লোকের মহাপরীক্ষায় বিচার হইয়াছিল। মৌলবী সাহেব হিন্দু বিদ্বেষী, তিনি যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাতে আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন। তদানিন্তন গবর্ণর জেনেরাল বরণ হেষ্টিংসকে তিনি এতৎ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, প্রথম খণ্ড এসিয়াটিক রিসাচিশ নামক গ্রন্থে তাহা প্রকাশিত হয়। তাহা হইতে মৌলবি সাহেবের কএকটী কথা উদ্ধৃত করিয়া আমরা এ প্রস্তাবের উপসংহার করিব।

মৌলবি সাহেব বলেন, ধট পরীক্ষার কালে অভিশপ্ত ব্যক্তির কি অপরাধ একটী পত্রে লিখিয়া দেওয়া হইত। অন্যান্য প্রক্রিয়া পূর্ব্বমত। তুলাদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইলেও অপরাধী বলিয়া গণ্য হইত। অগ্নি পরীক্ষার প্রক্রিয়া স্বতন্ত্র ছিল। নয়হাত দীর্ঘ একহাত প্রস্থ আধহাত গভীর খাদে পিপুল কাঠের আগুন জ্বালাইয়া অভিশপ্তকে তাহার উপর দিয়া হাঁটিতে হইত। জল পরীক্ষায় বাণক্ষেপ পরিবর্ত্তে যতক্ষণ একজন ধীরে ধীরে পঞ্চাশপদ না যাইত, ততক্ষণ জল মধ্যে মগ্ন থাকিতে হইত। বিষ পরীক্ষায় বিষাদমূল বা শঙ্ক বিষ খাইতে দিত, অথবা একটী কলসী মধ্যে সর্প রাখিয়া একটী অঙ্গুরী বা মুদ্রা ফেলিয়া দিত। সেই অঙ্গুরীয় উদ্ধৃত করিতে সর্প যদি দংশন না করিত, তবে নির্দ্দোষী বলিয়া প্রতিপন্ন হইত। তণ্ডুল পরীক্ষায় শালগ্রাম শিলার সহিত তণ্ডুলও ওজন করিয়া বা তণ্ডুল মন্ত্রপূত করিয়া খাইতে দিত। ফাল পরীক্ষায় লৌহ পিণ্ড বা বর্ষার ফলা উত্তপ্ত করিয়া হাতে ধরিতে দিত। ধর্ম্ম পরীক্ষায় রূপায় ধর্ম্মের প্রতিমা ও লৌহ বা মৃত্তিকায় অধর্ম্মের প্রতিমা গড়িয়া অথবা মাটীর পুত্তুলে শাদা রঙ্গ দিয়া ধর্ম্মের ও কাল

রঙ্গ দিয়া অধর্ম্মের মূর্ত্তি করিয়া গোবর মাখাইয়া বড় জালায় রাখিয়া দিত। ধর্ম্মের প্রতিমা তুলিতে পারিলে অভিশপ্ত নিষ্কৃতি পাইত। এই সময় বিষ ও তোয় ভিন্ন অন্যান্য প্রকারে স্ত্রীলোক দিগকেও পরীক্ষা করিবার রীতি প্রচলিত ছিল।

মৌলবি সাহেব বলেন, শঙ্কর নামে এক ব্যক্তিকে চোর বলিয়া অপবাদ দেওয়া হইয়াছিল। সাক্ষী ছিল না। অন্য প্রকার বিচার করিতে চাহিলেও বাদী প্রতিবাদী আগ্রহের সহিত অগ্নি পরীক্ষার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। পরীক্ষার ফল দেখিবার জন্যে মৌলবি সাহেব অগত্যা সেই রূপেই বিচার করিতে স্বীকার করিলেন। পরীক্ষাস্থলে হিন্দু মুসলমান সাহেব অনেকেই উপস্থিত ছিলেন। বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি হইতে পরীক্ষার যে নিয়ম আমরা উল্লেখ করিয়াছি ঠিক সেইরূপই হইয়াছিল। অগ্নিময় লৌহ পিণ্ড হাতে লইয়া সে সাত হাত চলিয়া ছিল, তাহার পর ঘাসের উপর পিণ্ড প্রক্ষেপ করিলে ঘাস জ্বলিয়া গিয়াছিল। অথচ তাহার একটী হাতেও ফোস্কা পড়ে নাই।

"He next to prove his veracity rubbed some rice in the husk between his hands; which were afterwards examined, and were so far from being burnt that not even a blister was on either of them. Since it is the nature of fire to burn, the officers of the Court, and people of Benares, nearly five Hundred of whom attended the Ceremony, were astonished at the Court; and this well-wisher to mankind (মৌলবি সাহেব) was perfectly amazed.

# দুইখানি পত্র।

## প্রশ্ন।

ভাই!—আমি জাতি-বৈদ্য, তুমি বিবর্ত্তবাদী। বংশানুক্রমে শীলধর্ম্মে ব্যাধিপরীক্ষার ক্ষমতা অনেকের অপেক্ষা আমারি অধিক আছে, তুমি স্বীকার করিতে বাধ্য। অনেক দিনের পর সে দিন তোমাকে দেখিলাম, তুমি সহসা বড় পরিবর্ত্তিত হইয়াছ; আমার অনুমান হইল, তোমার কোন ব্যাধি জন্মিয়াছে।

"পর্ব্বতো বহ্নিমান্ ধূমাৎ," ধূম দেখিয়া পর্ব্বতের জঠরনিহিত অনলের অনুমান করিতে হয়। কেহ কেহ বলেন অনুমান অপেক্ষা প্রত্যক্ষ প্রমাণের বল অধিক, আমি বলি যে অনুমানই উৎকৃষ্টতম এবং এক মাত্র প্রমাণ। প্রত্যক্ষ রূপান্তরিত অনুমান মাত্র।

সে যাহা হউক, তোমার বড় পরিবর্ত্তন হইয়াছে; তোমার চপলতার হ্রাস হইয়াছে। এত দিন শূন্য কুম্ভের ন্যায় তুমি জলের উপর ভাসিয়া বেড়াইতে ছিলে, আপাত-হিল্লোল মাত্রে তোমাকে দিক্‌দিগন্তে বিক্ষিপ্ত করিতে ছিল। তোমার ভাবের প্রবণতা, সরলতা, তোমার উৎসাহ, তোমার আনন্দ, তোমার শোক, তোমার দুঃখ, তোমার শোকের তীব্রতা, তোমার উল্লাসের প্রখরতা আমাদিগকে চমকিত করিত, কিন্তু মোহিত করে নাই। মোহকারী বিষাদ—বিষাদ প্রাণভরা, আর কাহাকে স্থান দেয় না। বিষাদ টলে না, উঠে না, স্থির, নিবাত, নিষ্কম্প। বিদ্যুৎগতিতে হৃদয়কে আকর্ষণ করে। বিষাদ দুঃখ নহে,

দুঃখে মুগ্ধ করে না, বিষাদ আনন্দ নহে, আনন্দ ক্ষণ-ভঙ্গুর, বিষাদে সুখের হাসি লতার ন্যায় জড়িত। বিষণ্ন তোমাকে আর কখন দেখি নাই। প্রাণভরা বিষাদে তোমার উজ্জ্বল চক্ষে স্থিরদৃষ্টি, উৎফুল্লবক্ষে দৃঢ়তা, ললাটে শান্তি, হৃদয়ে গভীরতা যোগাইয়াছে। তুমি কি রত্ন পাইয়াছ, তোমার হৃদয়-কলস পূর্ণ হইয়া জলের ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে। আর যেন ভাসিতে ইচ্ছা নাই, আর যেন বাহিরে থাকিতে চাহ না; আর যেন দেখা দিতে চাহ না, দেখিতে চাও; শুনাইতে চাহ না, শুনিতে চাও; বলিতে চাহ না, বলাইতে চাও। যে জন-কোলাহলের জন্য তুমি লালায়িত হইতে, সে কোলাহল এখন উপেক্ষা কর; যে সমাগমের আয়োজন উদ্ভাবনে বড় ব্যস্ত হইতে, সে সমাগম তোমাবিহনে শূন্য; হয়ত নিভৃত-কুট্টিমে পুস্তকে চক্ষু, হৃদয় আবেশে মুগ্ধ; নয়ত নীল বিশাল আকাশে যোজিতদৃষ্টি অন্যমনা। সূর্য্য অপেক্ষা চন্দ্র, চন্দ্র অপেক্ষা কাদম্বিনী, দিবা অপেক্ষা সন্ধ্যা, সন্ধ্যা অপেক্ষা নিশা তোমার ভাল লাগে। আগে যেখানে চাহিতে এখন সেখানে দেখিতেছ, আগে যেখানে ভাসিতে, এখন সেখানে ডুবিতেছ, আগে যেখানে ছুটিতে এখন সেখানে শুইতে চাও।

কি হলো অন্তরে ব্যথা।
বসিয়া বিরলে, থাকয়ে একলে
না শুনে কাহার কথা।
সদাই ধেয়ানে, চাহে মেঘ পানে
না চলে নয়নে তারা।

ভাই, তুমি কবি হইয়াছ, জগৎ অপূর্ব্বসৌন্দর্য্যে তোমার নিকটে এখন সুশোভিত। বৈশাখী পূর্ণিমা কতবার গিয়াছে,

কোকিলঝঙ্কার কতবার শুনিয়াছ, দধিয়ালের সুকণ্ঠসঙ্গীত, কুসুমের কোমলকান্তি, সৌদামিনীর তড়িতগতি কতবার দেখিয়াছ, কিন্তু এত সুন্দর, এত মোহন, এত প্রাণভরা আর কখন দেখ নাই। কল্পনা স্নেহ প্রীতি পূর্ব্বে বিস্তৃত ছিল, এখন বিশাল হইয়াছে। বুকের ভিতর জগতটা টানিয়া লইতে পার, সকলকেই বুকে তুলিয়া বুকটা শীতল করিতে চাও। তুমি প্রেম, শান্তি, পবিত্রতার এতদিনে আস্বাদ পাইয়াছ, অমর হইতে চলিয়াছ, বুঝিলাম। আগে যাহাকে ঘৃণা করিতে, এখন তাহাকে দয়া কর; আগে যাহাকে শত্রু বলিতে, এখন তাহাকে প্রীতি কর; আগে যাহাকে শিষ্য বলিতে এখন তাহাকে গুরু বল; আগে যাহাকে উপদেশ দিতে এখন তাহার উপদেশ লও। তোমার শিক্ষার অহঙ্কার ভাঙ্গে নাই, প্রেমে কোমল হইয়াছে। আগে চমকিত করিতে, এখন চমকিত হও; আগে উন্মত্ত করিতে এখন বিহ্বল; আগে নাচাইতে এখন আবেশে মুদিত; আগে আপনার ছবি জগতের ললাটে অঙ্কিত করিতে প্রয়াস পাইতে, এখন অন্যের ছবি হৃদয়ে এমনি সাবধানে ধরিয়াছ যেন না টলে। তুমি যুবা ছিলে বালক হইয়াছ, যৌবনের উদ্দামতা কমিয়া বালকের কোমলতা পাইয়াছ; যৌবনের তেজস্বিতা গিয়া বালকের লালায়িততা আসিয়াছে। ভাই, তুমি কি অমূল্যরত্ন পাইয়াছ, বুকের ভিতর লুকাইয়া আপনি একা দেখিবে, সদা সতর্ক, যেন আর কেহ না দেখে; বুকের উপর কিসের দাগ পড়িয়াছে লুকাইতে চাও, যেন অপবিত্র চক্ষু তাহার উপর না পড়ে; যেন পাপীর নিশ্বাসে তাহা কলঙ্কিত না হয়। ভাই, তুমি এখন অন্যমনা। আগে শ্রুতিধরছিলে এখন দশবার ডাকিয়া উত্তর দিলে না; আগে সকল

কথাই আপনি বলিতে, এখন একটা কথা ফুরাইতে পারিলে সুখী হও; অন্যে কথা কহিতে লাগিলে যেন আনন্দে অবসর লও। হৃদয়ের ভিতর দেবতা, তাই চক্ষু মুদিত; বাহিরে দেবতা তাই চক্ষু উন্মীলিত; সর্ব্বব্যাপী দেবতা, তাই স্থির দৃষ্টি অসীম—দিবানিশি ধ্যানমুগ্ধ। সেই বীজমন্ত্র গোপনে দিবানিশি জপ কর, তুমি সেই শক্তি প্রভাবিত, সেই প্রকৃতি পরিণত, সেই পরিবৃত্তি পরিবর্ত্তিত—তুমি তন্ময়।

নাচিনে মানুখ নিমিখ নাই,
কাঠের পুতলি রহিছে চাই।

তাহার কথা বলিতে চাও না, ভাবিতে চাও, শুনিতে চাও। তাহার মত কে তাহা বল, সে কে তাহা বল না; নিজে সে নামটী মুখে তুলিতে পুলকিত হও।

অন্যে তাহার নাম করিলে তুমি কম্পিত হও,—সে কম্পন হিংসা জনিত নহে, ভয়জনিত—তুমি গোপনে তাহার নামটী যখন জপ কর, তখন সে নামটী আমি আড়ি পাতিয়া শুনিয়াছি। পাছে আমার ওষ্ঠস্পর্শে—তোমার সেটী কলঙ্কিত হয়, আমি সে নামটী মুখে তুলিতে সাহস করিলাম না। কিন্তু ভাই তিনি তোমার কে?

তোমার ভাবের স্থিরতা নাই। আবর্ত্ত-তাড়িত সরসি-হিল্লোলের ন্যায় বিভিন্ন মুহূর্ত্তে তুমি বিভিন্নমূর্ত্তি। বিষণ্ন হৃদয়ের প্রান্ত প্রদেশ কখন প্রদোষভানুর কনক রঞ্জিত, কখন চন্দ্রিকার ছায়াময় কিরণে স্বপ্নাচ্ছন্ন। জীবন্ত অনলগিরি কখন সুপ্ত; কখন উচ্ছ্বসিত; শৃঙ্খলাবদ্ধ পর্ব্বতের রোষকষায়িত শৃঙ্খলমাত্র আতঙ্ক জনক। তোমার কোন বায়ুরোগ হইয়াছে। ভয় নাই তুমি ভীত; ত্রাস নাই তুমি ত্রস্ত; উল্লাস

নাই তুমি হসিত, শীতে তুমি উত্তাপিত, গ্রীষ্মে তুমি কম্পিত, "পীনতনু ক্ষীণ ভেল, হার ভেল ভার, ফুল ভেল শূলসম উলট ব্যবহার।" রোগ ভিন্ন ঘন ঘন দীর্ঘশ্বাসের অত বায়ু আর কে যোগাইতে পারে ?

তোমার অন্যমনস্কতা ভাঙ্গাইতে কত চেষ্টা করিলাম, ভাঙ্গাইতে পারিলাম না। যাহাদিগের সংসর্গে কত আনন্দ পাইতে, তাহারা আসিল, তোমার আবেশ ভাঙ্গিল না। তুমি যে শাস্ত্রালোচনায় প্রভূত আনন্দ ভোগ করিতে, সে শাস্ত্রকথা পাড়িলাম, তোমার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিলাম না। অপরে বুঝিল না, প্রাচীন চতুরতায় তাহাদিগকে প্রতারিত করিলে ; কিন্তু ভাই আমাকে ঠকাইতে পার নাই ; বলিয়াছি ত আমি জাতিবৈদ্য, লক্ষণতত্ত্বে সুপণ্ডিত। দুই একবার তুমি আবেশ ভাঙ্গিতে, এক মুহূর্ত্তের জন্য জাগিতে চেষ্টা করিয়াছিলে, কিন্তু পারিলে না—তুমি দুর্ব্বল মন্ত্রমুগ্ধ নিদ্রিত, স্বপ্নপ্রয়াণের ন্যায় তোমার চেষ্টা বিফল—"পাসরিতে করি মনে পাসরা না যায় গো, কি করিব কি হবে উপায় ?"

সামান্য ধনে যাহারা ধনী তাহারা ধনের বড়াই করে। তোমার লব্ধধন কোহিনূর ; গর্ব্বের উচ্চতার উচ্চে তুমি ফলভরে অবনত, ভিখারী বেশে ভিখারীর দলে মিশিতে চাও। একি অপূর্ব্বভাব ! যাহাদের মানসচিত্র অস্ফুট, মুছিয়া যাইবার ভয় থাকে, তাহারা প্রতিকৃতি সঞ্চয় করিয়া রাখে, মুমূর্ষু অবস্থায় বিষবড়ি প্রয়োগ করিবে। যাহারা ভাবেভোর, তাহারা সুরাপান তুচ্ছ করে। ভাই তুমি মাতাল, নেশায় ডুবিয়াছ, মানস চিত্রের উজ্জ্বলতায় বাহিক সাহায্য উপেক্ষা করিতে পারিয়াছ, স্বাবলম্বী হইয়াছ, আপনাতে আপনি পূর্ণ অথচ

বিনীত। তোমার এ দেবভাব আর কখন দেখি নাই। তুমি তপস্বী হইয়াছ, সদাই ধ্যান নিমীলিত নেত্র,—কিন্তু সন্ন্যাসী নহ। স্বতন্ত্র নির্জ্জনপ্রিয়, কিন্তু বনবাসী নহ। তোমার সে বৈরাগ্যভাব কোথায় গেল? এখন আপনার প্রতি অনুরাগ জন্মিয়াছে। আগে আমাদের ভাল বাসিতে, এখন আপনাকে ভাল বাস। আগে আমরাই তোমার সর্ব্বস্ব ছিলাম, এখন তুমি তোমার সর্ব্বস্ব হইয়াছ। তুমি নূতন যোগী তোমার যোগে আত্মপীড়ন, সন্ন্যাস, বৈরাগ্য নাই, অথচ বিলাস, বিজয়, উল্লাস নাই। তুমি যোগী রামানন্দ, চৈতন্যের গুরু; বিলাসী সন্ন্যাসী, গৃহস্থ বৈরাগী, আত্মপ্রিয় যোগী। এ কর্ম্মযোগ নহে, জ্ঞান যোগ নহে, আমার নিদানে ইহার সংজ্ঞা প্রেমযোগ। অনুমানটী কি ঠিক হইয়াছে ভাই?

---

## উত্তর।

ভাই, আমি দেবপূজায় মত্ত, আমি রাজযোগে যোগী! ঈশ্বর প্রেমময়, ঈশ্বরের জগৎ প্রেমময়! সকলেই সকলকে চাহে, কেহ কাহাকে প্রত্যাখ্যান করে না। প্রত্যাখ্যান প্রেমের বিরহ, প্রেম বৈচিত্র্য, প্রেমের রূপান্তর মাত্র। প্রেমের রূপান্তর বল, বলের রূপান্তর তেজ, তেজের রূপান্তর জ্যোতি, জ্যোতির রূপান্তর তড়িত, তড়িতের রূপান্তর প্রাণ। মাধ্যাকর্ষণ বল, যোগাকর্ষণ বল, কৈষিক আকর্ষণ বল, সকলই প্রেমের রূপান্তর। "যে যাহারে ভালবাসে, সে যাইবে তার পাশে।" প্রেমে জগত স্বষ্ট বলিলে ভাব ফুরায় না, প্রেমে জগত প্রাণিত বলিলেও তৃপ্তি হয় না, বল প্রেমই জগত। পশু, পক্ষী, লতা, পাতা, চাঁদের আলো, মেঘের ছটা, পাখীর গান, ফুলের বাস,

শিশুর হাসি, নদীর খেলা, মেঘে সৌদামিনী কেন জড়িত? পর্ব্বতে কুয়াসা কেন শায়িত? হরিণী কেন বায়ুর সঙ্গে ছুটে? চকোর কেন বুক ভাসায়ে গগন সাগরে সাঁতার খেলে, কাহে সে ভঁওরা ফুলে ফুলে বুলে?—এসব প্রেমের খেলা। গা ঘেঁসিয়া বায়ুটী যেই বহিল, অমনি তালে তালে পাতা গুলি নেচে উঠিল; কুসুমের সৌরভটী যেই ছুটিল, অমনি গুণ গুণ গুণ; মেঘরাজ চাঁদপানা মুখখানা যেই দুই হাতে চাপিয়া ধরেন, অমনি ষড়জস্বরে পাখী "নৌবত বাজে"। উষার আভাষ না পাইলে কি দধিয়ালের সুকণ্ঠে টোরিস্বর বাহির হয়? ঈশ্বর প্রেমময় নহেন, ঈশ্বরই প্রেম, ঈশ্বরই রস, বিশ্বময়, রসময়।

ভাই, প্রেমিক বিনা কেউ কি কাঁদিতে পারে? যে না কাঁদিয়াছে সে প্রেম চিনে না। যার প্রেম যত অধিক সে তত কাঁদে, যে না কাঁদে সে পাষাণ। না!—পাষাণেরও প্রেম আছে, হৃদয় আছে, নহিলে সেহালা এত সোহাগ করিবে কেন? নহিলে সে সোণাপানা রঙ্গটী দেখিলে বুকটী পাতিয়া লইবে কেন, বা লইবে তা যতনে পোষিবে কেন? বলিয়াছি প্রেমময়মিদং জগৎ—যাহা আছে, যাহা ছিল, যাহা হইবে, যাহা বস্তু, যাহা বিদ্যা, সকলই প্রেমময়, তাই প্রেমের কবি গাহিয়াছেন,— না সতো বিদ্যতে ভাবঃ, না ভাবো বিদ্যতে সতঃ—। শিশু জন্মিয়াই কাঁদে, নির্ঝর জন্মিবামাত্র ঝির ঝির করে, সেই দিন তাহার প্রেমের পথ খুলে। যার যত বয়োবৃদ্ধি, তত প্রেম বৃদ্ধি, শেষে সারগসঙ্গমে মহা প্রস্থান, দান সাগর। সরিৎ, সরসি, তড়াগ, নদী, কন্যা, স্ত্রী, ভগিনী বা জননী একই মহাসাগরের রূপান্তর। অল্প হইতে অধিক, মাত্রার ইতর

বিশেষ, প্রেমোদধির সোপান পরম্পরা, সেই উদধি বিশাল, বিশ্বব্যাপী, বিশ্বরূপ, বিশ্বময়। দর্শন বিজ্ঞান সেখানে পরাস্ত, প্রেম-শাস্ত্র যেখানে মুক্তপক্ষ; দ্বৈতবাদ অশাস্ত্র; অদ্বৈতবাদ একমেবাদ্বিতীয়ং একমাত্র সত্য। বিশ্ব নাই, জগত নাই, তুমি নাই, আমি নাই, সৎ নাই, অসৎ নাই, বস্তু নাই, ছায়া নাই, মায়া নাই, মোহ নাই, বিবাদ নাই, বিসম্বাদ নাই—সকলই প্রেম স্বরূপ, রস স্বরূপ "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো" "সোঽহং" একমাত্র অক্ষয়, অব্যয়, অনাবিল সত্য; দেহ অঙ্গ নাই, হস্ত পদ নাই, চন্দ্র সূর্য্য নাই, বৃক্ষ লতা নাই, সকলই দেহ, সকলই সেই এক। স্ত্রী পুত্র নাই, ভ্রাতা ভগিনী নাই, মাতাপিতা নাই, আত্মপর নাই, আমার তোমার নাই—সকলে সেই এক; লিঙ্গ শূন্য, বর্ণ শূন্য, বিকার শূন্য 'তৎ'। তুমি আমি সকলই তাহার, পুত্র কন্যা সকলই তাহার, আমার যাহা কিছু সকলই তাহার। তৎসৎ-আর সব মিথ্যা। যাহা সৎ তাহাই তৎ, যাহা তৎ নয় তাহা নয়, নাই, হইবে না। ভাবশূন্য অসৎ; যাহা তৎ তাহাই ভাবময়। বিদ্যা রূপবতী, রূপবতী রসস্বরূপা প্রকৃতি প্রেমময়ী, প্রেম আদি প্রেম অন্ত, এক প্রেমই সৎ; অসজ্জনেরাই অপ্রেমিক।

বিবর্ত্তবাদের মূলসত্য প্রেম। উত্তরাধিকার বল, আপেক্ষিক বিকার বল, প্রেমের রূপান্তর। শরতের নিষ্কলঙ্ক জোছনা, কুসুমের কোমল কান্তি, কাদম্বিনীর গাম্ভীর্য্য, সৌদামিনীর প্রতিভা আমাকে মুগ্ধ করে প্রেমবশাৎ; পিতার প্রখরবুদ্ধি, পিতামহের তেজস্বিতা আমি লাভ করিয়াছি, প্রেমবশাৎ। প্রাচীন বিবর্ত্তবাদিগণ পার্থিব প্রকৃতির বৈসাদৃশ্যে চমকিত হইয়া বিবর্ত্তবাদ উদ্ভাবন করেন, আধুনিক বিজ্ঞতর বৈজ্ঞানিকগণ

প্রকৃতির সাদৃশ্যমোহিত। আজন্ম প্রত্যেক জীবাণু শত কোটী বিভিন্ন কারণ প্রভাবিত, প্রত্যেকে ভিন্ন পথে পরিচালিত, তথাপি জগতে এত সাদৃশ্য কেন? পাতায় পাতায় লতায় লতায় চোখে চোখে, হাতে হাতে, মনে মনে, প্রাণে প্রাণে, এত সাদৃশ্য কোথা হইতে? পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ ব্যাখ্যা করিতেন একই কারণে একবিধ পদার্থ ভিন্ন পথে চলে কেন; এখনকার পণ্ডিতগণ বুঝাইতেছেন ভিন্ন কারণে ভিন্নবিধ পদার্থ একই পথে চলে কেন। ব্যাখ্যা উভয়ের একই—Tendency—তুমি আমি ভিন্ন গৃহে ভিন্ন ভাবে পরিপোষিত; অধিকার ভিন্ন, শিক্ষা ভিন্ন, সংসর্গ ভিন্ন, অথচ দুই জনের সাদৃশ্য এত অধিক, পাক এমনি পড়িয়াছে, যে পাশাপাশি হইবামাত্র দুই জনে জড়াইয়া গেলাম, একেবারে প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে জড়াইয়া গেল। এমনটী কি প্রকারে হইল বল দেখি?

বিবর্ত্তবাদের প্রধান আচার্য্য ডারবিন এই Tendency বা প্রবণতা দ্বারা চেতন অচেতনের প্রভেদ করিয়াছেন; এই প্রবণতা জীবোৎপত্তির কারণ, কীটাণু হইতে নীচতর যে বিম্বাণু, তাও এই প্রবণতা প্রভাবিত। সেই প্রবণতা কালক্রমে পুরুষের তেজ, সতীর প্রেম, বালকের হাসিতে পরিণত হইয়াছে। সে প্রবণতার উৎস কোথায়? অন্ধতম কুটীরের গভীরতম প্রদেশে অগ্রসর হইয়া ডারবিন পুরোভাগে পাদক্ষেপ করিতে আর সাহস করেন নাই। এই স্থান হইতে তিনি পরাঙ্মুখ। কাব্য এখানে অগ্রসর হয়, এই Tendency সেই বিশ্বপ্রেমের অংশ। প্রেম Tendency হইয়া জীবন কোষ অনুপ্রাণিত করে, ক্রমে বিকাশের পর বিকাশ। শেষে বিশ্ববিশাল সহৃদয়তায় পরিণত হয়। বিজ্ঞান, দর্শন, কাব্য, সকল শাস্ত্রের কুটিল

রহস্য প্রেমমন্ত্রে সরল, সহজ, স্মিতানন। এমন সোণার চাবি পিটর পান নাই, এই চাবিতে ইহকাল, পরকাল, স্বর্গ ও মর্ত্ত্য সকলই উদ্‌ঘাটিত হয়। ইহাই সেই সঞ্জীবনী সুধা।

নদীর বাঁধ কাটিয়া দাও, সে ছুটিয়া সাগরে পৌঁছিবে; হরিণীর শৃঙ্খলভগ্ন কর, সে বায়ুচারিত বনভূমে পলায়ন করিবে; পিঞ্জরের দ্বার খুলিয়া দাও, সারিকা গগন মুখে ধাবমান হইবে; শিশুর গতি মায়ের ক্রোড়ে, মরালের গতি মানস হ্রদে, পৃথিবীর গতি সূর্য্য পার্শ্বে, বিশ্বের গতি প্রেমের অনন্ত মণ্ডলে। কেবল মায়ায় চক্ষু অন্ধ করিয়া মনুষ্যকে জড়পথে পাতিত করে। মোহ আবরণ খুলিয়া লও, "রাধিকার বেড়ী ভাঙ্গ" কৃত্রিমতা, অস্বাভাবিকতা, সামাজিকতা, কাপুরুষতা, প্রতারণা, মৌখিকতা কর্ম্মনাশা জলে ডুবাইয়া দাও, জগত সুস্থ হইবে, প্রকৃতিস্থ হইবে, রসাল হইবে, পবিত্র শুদ্ধ সুধাময় প্রেমে সকল প্রফুল্ল হইবে। সেই প্রফুল্লতার নাম যৌবন। বিশ্ব চির-যৌবন লাভ করিবে। তখন চাঁদের আলোয় আর এক ছটা, ছায়াপথে আর এক শোভা, নীলাকাশে আর এক রূপ, পাখীর কণ্ঠে আর এক স্বর ফুলের সৌরভে আর এক গন্ধ, নদীর কল কলে আর এক শব্দ, মায়ের স্নেহে আর এক রস, প্রণয়ে নূতন মধু, হৃদয়ে নূতন বল, দেহে নূতন কান্তি, চক্ষে নূতন জ্যোতি দেখা দিবে, বিশ্ব নবরূপ ধারণ করিবে; কল্পনা তার অন্ত পায় না, কবিগণ তাহাকেই স্বর্গ বলিয়া চিত্র করেন।

সেই পৃথিবী স্বর্গ, সেই স্বর্গ দেবতা, সেই দেবতা ঈশ্বর, সেই ঈশ্বর প্রেম, তখন অদ্বৈতবাদ বুঝিতে আর বাধা থাকে না। মনুষ্য কর্ম্মফলে অচিন্ত্য চিন্তা করিতে পারে না, অব্যক্ত অনুভব করিতে পারে না, ঈশ্বরকে অতীন্দ্রিয় অগ্রাহ্য বলিতে

বাধ্য হয়। মহাসাগরের বিশালতা তাহাকে স্তম্ভিত করে, তুঙ্গ তরঙ্গের চঞ্চলতা তাহাকে ত্রাসিত করে। স্বাভাবিকতা তাহার নিকট কৃত্রিম বলিয়া প্রতীয়মান হয়। দুর্ব্বল মনুষ্যের এই হীনতা অতি শোচনীয়। অথচ তাহারা তাহাতেই গৌরব করে। গোলামের জাতি গোলামি করিতে গর্ব্ব করে। শৃঙ্খলকে অলঙ্কার বলে। সে সুধা বলিয়া বিষপান করে, স্বর্গ বলিয়া নরক খোঁদিন করে, নরককে গৃহ বলে, দাসীকে স্ত্রী বলে, মৃত্যুকে পুত্র বলে, কীটকে কুসুম বলে, কুসুমকে পদতলে দলন করে। বিকৃত রাক্ষস, যাহাকে সুস্থ দেখে তাহাকে সমাজচ্যুত করে; স্বভাব তাহার ঘৃণিত; সে মড়ার গলায় বরমালা দেয়, শত্রুকে মিত্র বলে, মিত্রকে দ্রোহী বলিয়া নির্ব্বাসিত করে। হায় আর একজন প্রমিথিউস কবে পৃথিবীতে উদয় হইবে।

ভাই, মনুষ্য আদর্শ চাহে। বিশ্বপ্রেম আয়ত্ত করিতে আদর্শের আবশ্যক। সকল কার্য্যে সাধনা চাই। বিশ্বপ্রেমের আদর্শে আমি দেবী প্রতিমা স্থাপন করিয়াছি। সে প্রতিমা কবিশ্রেষ্ঠ ঋষিশ্রেষ্ঠদিগের অনুমোদিত। সেই আদর্শ আমার চপলতা হরণ করিয়াছে, বাচালতা শাসন করিয়াছে, ইন্দ্রিয়দমন করিয়াছে, স্বর্গের আভাস দিয়াছে, প্রেমের আস্বাদ দিয়াছে, অমৃতের অধিকারী করিয়াছে। ভাই, তুমি সত্যই বলিয়াছ আমি অমর হইতে চলিয়াছি। যে প্রেম চিনে না সে স্বর্গের অধিকারী নহে। দিল্লীতে যোগমায়ার মন্দির দেখিয়াছিলাম, প্রতিদিন নবকুসুমে মায়ের প্রতিমা গঠিত হয়। আমার প্রতিমা কল্পনা গ্রাহ্য ইন্দ্রিয়ের অতীত; কুসুমের সৌরভ চাঁদের আলো মেঘের গম্ভীরতার উপাদানে গঠিত; ঈশ্বরের অবতার প্রেমের মূর্ত্তি সুখের উৎস, বিষাদের আকর, জগতের অভূতপূর্ব্ব

প্রাণতা। তিনি আমার কেহ নহেন, আমি তাঁহার তিনি জগতের। যে সাধনা করিবে সেই তাঁহাকে পাইবে। যোগের পরিণাম, ধ্যানের চিন্তা, ছায়ার স্বপ্ন, উপাসনার ভক্তি; তাঁহারই আমি আর কাহারই নহি, আমি নিজেরও নহি, আমি তাঁহারই। আশীর্ব্বাদ কর, আমার সাধনা সিদ্ধ হয়, আমি প্রেমের অধিকারী হই।

প্রেম বড় না জ্ঞান বড়? এতদিন যৌবনের উদ্দামতায় জ্ঞানের নবীনতায় মুগ্ধ হইয়াছিলাম। বুদ্ধির প্রখরতা, জ্ঞানের চপলতা জগতের শ্রেষ্ঠ পদার্থ বলিয়া বিবেচনা করিতাম। মস্তিষ্কের চটুলতা উপেক্ষা করিলাম, যে দিন হৃদয়ের গভীরতা পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম; সেই দিন বুঝিয়াছি জগতের যাবতীয় বিজ্ঞানবিতের জ্ঞানসমষ্টি প্রেম কণার তুল্য মূল্য নহে। একজন হৃদয়বান লক্ষ জন বুদ্ধিমানের সমকক্ষ। শয়তানের বুদ্ধি কোটি স্পেন্সর ডারবিন বেন্থাম ও কোমতের অনধিগম্য, সে শয়তান নরকের কীট। মিফিষ্টফিলিস কাঞ্চনজঙ্ঘার পাদদেশে, ফষ্ট তাহার শিখরে। তাই জ্ঞানযোগ ছাড়িয়া প্রেমযোগ সর্ব্বস্ব করিয়াছি। বুদ্ধির ভেলা ছাড়িয়া দিয়া প্রেমের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়াছি। আশীর্ব্বাদ কর যেন কূল পাই।

---

# মান।

আজি পূর্ণিমা, শরচ্চন্দ্র ষোলকলায় পরিপূর্ণ। ঝম ঝম করিয়া জোছনার রাশ ভুবন ভরিয়া দিল। শিশির-সিক্ত শীতল বায়ু ধীরে ধীরে উঁকি মারিতেছে। আকাশে দু একটী পাখী ছুটাছুটী করিতেছে,—তার উপরে নীল গগন ভেদ করিয়া ঐ একটী দুইটী তারা চাহিয়া চাহিয়া কি দেখিতেছে! আজিকার রাত্রি বড় মধুর,—"আজি মধুরে মিশাব মধু পরাণ বঁধু"—আমার অনেক দিনের বাসনা আজ পূরাইব—প্রাণভরা সাধ আজ মিটাইব—

এস এস বঁধু এস
আধ আঁচলে বস
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি।

গুরুজনার মাঝখানে ঘোমটা খুলিয়া নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখিতে পাই না। বড় লজ্জা লজ্জা করে। দশ জনে চাহিয়া থাকিবে—ছিঃ, ইতর চক্ষে দেখিবে, আমাদের চারি চক্ষের মিলন হইবে? নয়নে নয়নে যে ভাবের খবর চলিবে, অন্যে বুঝিবে? বড় লজ্জা করে, আমি তা পারিব না। পাশে লোক চাহিয়া থাকিবে, আর আমি তোমায় দেখিব, তাহাও পারিব না, আর মাঝখানে খানিক আকাশ, খানিক বাতাস, খানিক ব্যবধান থাকিবে, আর আমি তোমায় দেখিব, দূরবীণ কসিয়া তোমাকে দেখিতে হইবে, তাতে আমার আশা মিটিবে না। এমন মধুর জোছনায় এত ব্যবধান? নিত্য যাহা, আজ তাহা নহে। আজ প্রকৃতি অসামান্যা রূপবতী। এমন রাত্রি আর দেখি নাই। কখন যেমন করিয়া তোমাকে দেখি নাই,

আজি তেমনি করিয়া দেখিব, আজি বুকটা জন্মের মত পূরা-ইয়া লইব ;—এমন দিন আর পাইব না। তাই বলি, বঁধু কাছে এস, আরো কাছে, আরো কাছে এই আধ খানা আঁচলে বস—

এস এস বঁধু এস, আধ আঁচলে বস,
নয়ন ভরিয়া তোমায় দেখি,
অনেক দিবসে, মনের মানসে
সফল করিয়া আঁখি।

তোমার জন্য অনেক সহিয়াছি, অনেক কাঁদিয়াছি। আজি শত বৎসরের দুঃখ এক দিনের সুখে ডুবাইব।

তুয়া বঁধু পড়ে মনে, চাহি বৃন্দাবন পানে,
আলুইলে কেশ নাহি বান্ধি,
রন্ধন শালাতে যাই, ধুঁয়াতে যাতনা পাই,
ধুঁয়ার ছলনা করি কাঁদি।
মণি নও মানিক নও, হার করে গলে পরি,
ফুল নও যে কেশের করি বেশ,
নারী না করিত বিধি, তুয়া হেন গুণনিধি
লইয়া ফিরিতাম দেশ দেশ।

তোমার অভাবে সংসারে কর্ম্ম-স্পৃহা থাকে না। গুরু-জনার ভয়ে করিতেও হয়। ভয়ে ভয়ে করি, কোন কাজটী ভাল হয় না। সবাই তিরস্কার করে, তখন তোমার উপর অভিমান করিয়া পা ছড়াইয়া কাঁদিতে বসি। তোমাকে সম্মুখে দেখিলে আমার গায়ে বল হয়, মনে স্ফূর্ত্তি হয়, এক নিমেষে কত কাজ করিয়া ফেলি। দাসীর কাজ করিতে, আমি রাজরাণী, কখন আমার সঙ্কোচ হয় না। তোমার

অভাবে কোন কিছুই ভাল লাগে না। তোমার অগৌরবে সদাই চোখ ছলছল করে, সদাই কাঁদি। তিরস্কারেও কাঁদি, পুরস্কারেও কাঁদি। লোকে অভিমানী, অহঙ্কারী, দুর্ব্বল, ভীত, কত কি বলে। আমি কেন কাঁদি, তা তুমি জান, সে সব কথা এখন থাক্—পুরাণ কথা কহিয়া এ সুখের নিশা নষ্ট করিব না। অনেক দিনের পর পাইয়াছি, অনেক সাধ করিয়া আসিয়াছি। পায়ের তলে বাগানে শত ফুল ফুটিয়াছে, তোমার কাছে বসিবার এমন সময়টী আর হবে না। আজি দেহ প্রাণের সাজ সজ্জা করিয়া অভিসারে আসিয়াছি, পৃথিবী নীরব, জন-মানবের কোলাহল নাই। এই একদিন তুমি আর আমি একা হইয়াছি, তোমাকে একাকী পাইয়াছি—

বঁধু আর কি ছাড়িয়া দিব,
হিয়ার মাঝারে যেখানে পরাণ
সেখানে রাখিয়া থোব।
কাল কেশের মাঝে, তোমা বঁধু রাখিব
পূরাব মনের সাধ,
গুরুজন জিজ্ঞাসিলে, তাহে পরবোধিব
পরিয়াছি কালপাটের জাদ।

বঁধু আমার আশা অতি অল্প। যাহারা তোমাতে ডুবিতে চায়, তাহারা বড়লোক। বড় লোকের বড় কথা। আমি দীনহীনা কাঙ্গালিনী; আমার আশা অতি অল্প। তারা তোমার সঙ্গে পরাণে পরাণে মিশাইতে চায়। এক অঙ্গ হইয়া যাইতে চায়, তারা সোঽহং বলিয়া গর্ব্ব করে। আমি পরাণে পরাণে বাঁধিতে চাই না। আমি বলিতে পারি না যে—"পরাণে পরাণে বাঁধা আপনা আপনি।" আমি তোমার চরণের দাসী—

তোমার চরণে, আমার পরাণে
বাঁধিব প্রেমের ফাঁস।

আমার সাধ নিকটে বসিব, প্রাণ ভরিয়া মুখখানি দেখিব, আর তোমার সেবা করিব। একে প্রীতি বল, ভক্তি বল, যাহা ইচ্ছা তাহা বল, জিনিসটা এই। আমার সারা প্রাণটা সব দেহটা তোমাতে ভরা। জগতে আমার আর কেহ নাই—

তোমারে বুঝাই বঁধু তোমারে বুঝাই,
ডাকিয়া সুধায় মোরে হেন জন নাই,
অনুক্ষণ গৃহে মোরে গঞ্জয়ে সকলে
নিশ্চয় জানিও মুঞি ভখিমু গরলে।
এছার পরাণে আর কিবা আছে সুখ,
মোর আগে দাঁড়াও তোমার দেখিব চাঁদমুখ।

আমি তুদণ্ডের জন্য অভিসারিকা হইয়াছি। ঘরে পরে সবাই আমাকে লাঞ্ছনা দেয়, কেহ কলঙ্কিনী বলিয়া তিরস্কার করে, কেহ শ্যামসোহাগিনী বলিয়া উপহাস করে। আমার তাতে লজ্জা নাই, ভয় নাই। আমি তোমাতে মজিয়াছি। তোমাকে না দেখিলে আমার প্রাণ কেমন করে, তাই সুবিধায় অসুবিধায় ছুটিয়া আসি। কবে কি ঘটিবে জানি না, আর আসিতে পাইব কিনা জানি না। তাই আজি এমন সুন্দর শারদী পূর্ণিমায় তোমায় একবার প্রাণ ভরিয়া দেখিয়া যাই। কই বঁধু, আমার দিকে মুখ ফিরাও। অমন করিয়া রহিলে কেন? আজি অত বিরস ভাবে অন্য মুখে বসিয়া কেন? আমার উপর বিরক্ত হইয়াছ? দেহি পদপল্লবমুদারং বলিয়া কি সাধিতে হইবে? ছি, লোকে দেখিলে বলিবে কি? আমি যে স্ত্রীলোক, ও সাজটা যে পুরুষের একচেটিয়া।

আমি তোমাকে এতই ভালবাসি যে, ও কাজটা করিতেও আমার লজ্জা হয় না। বুকের মাঝে তোমার পা দুখানি রাত্রি-দিন পূজা করিব, তবে কি না লোকে দেখিলে বলিবে কি? আর তুমি নিজেই বা কি ভাবিবে? আমাকে বড় লালসাময়ী বলিয়া তোমার বোধ হইবে। আমি পরের স্ত্রী পরপুরুষ ভেটিয়াছি, শীত গ্রীষ্ম ঝড় বৃষ্টি নদী গিরি কানন প্রান্তর মানি নাই। যেখানে যখন তোমার বাঁশরী বাজিয়াছে, তখন সেখানে ছুটিয়া গিয়া উপস্থিত হইয়াছি; সর্পকে রজ্জু, শব-দেহকে ভেলা করিয়া নদী প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিয়াছি, আমাকে লালসাময়ী বলিয়া প্রতিবাসীরা নিন্দা করিতে পারে। আমি সতী কি অসতী, তোমাতে সকলি বিদিত। তুমি যেমন আমাকে চিন, এমন আর কেহ চিনে না। তুমি যদি আমাকে লালসাচালিত বল, আমার এ ব্যথা রাখিবার আর স্থান নাই। যদি নিঃস্বার্থ প্রেম জগতে থাকে, তাহা রাধিকার: যদি মানুষে কেহ সতী থাকে, সে রাধিকা। সতী কি কলঙ্কিনী, অপরে এক মুহূর্ত্তের জন্ম ভাবিতে পারে; কিন্তু তুমি জান, উত্তরমুখ নির্দ্দেশী শলাকার মত আমি একান্ত মনে তোমাকেই ভজনা করি। সাক্ষী ধ্রুব তারা, সাক্ষী ঐ অরুন্ধতী।

বঁধু তোমার কি হইয়াছে? আজি তোমার কটাক্ষে এত ভীরতা কেন, মুখে এত গাম্ভীর্য্য কেন? আমার উদ্দামতার দমন করিতে? নিরাশার যাতনা আমাকে শিখাইতে? বুঝা-ইতে যে যাহা চাহে সে তাহা পায় না; বুঝাইতে যে মিলন কেবল অনন্তে সম্ভবে? তাই ভাল, তুমি যাহা শিখাইবে আমি তাহাই শিখিব। অথবা তোমার কি চন্দ্রাবলীকে মনে পড়িয়াছে? কোথা সে বিধুরা বালা, ভাবিয়া কাতর হইতেছ?

লজ্জা কি, মনের কথা বল না? আমি তোমার চরণ ছুঁইয়া বলিতে পারি, চন্দ্রাবলী যে তোমাকে ভালবাসে, সে জন্য আমি একটুও দুঃখিত নহি। আমি যাহাকে ভালবাসি, লক্ষ জনে তাহাকে ভালবাসে, এ ত গৌরবের কথা। এতে আমার হিংসা হয় না;—হইবে না। তোমার গরবে গরবিণী আমি রূপসী তোমার রূপে, তোমাকে যত অধিক লোকে আদর করিবে ততই আমার গর্ব্ব বাড়িবে। আমি যে কোহিনুর পাইয়াছি, চন্দন তরু ভ্রমে বিষবৃক্ষ আশ্রয় করি নাই, এ কথা বুঝিয়া আমার আত্মশ্লাঘা বাড়িবে। বল না তুমি কি ভাবিতেছ?

"তুঁহ যদি লক্ষ গোপী সনে বিলসহ তাহে মুই পাই আনন্দ।
সো মঝু অন্তরে কোটি সুখ হোয়ত মোহে নাহিক মন্দ।"

তোমাকে লইয়া শত জনে সোহাগ করুক, আমার মত সবাই শ্যামসোহাগিনী হউক, আমার তাতে ক্ষতি বৃদ্ধি নাই।

"আমার মত তোমার শতেক গোপিনী
তোমার মত বঁধু তুমিই গুণমণি,
দিনমণির আছে শত কমলিনী
কমলিনীর একা দিনমণি ওই।"

আমি আজ হৃদয়ের বসন খুলিয়া দিয়াছি। যে দুর্ব্বলা, যে অসতী, সে অবগুণ্ঠনে আপনাকে আবরিত করুক। আমি সতী একান্তপ্রাণা, যমুনা-পুলিনে নীপ তরু-মূলে গোপিকার বস্ত্র অপহরণ করিয়া তুমি শিখাইয়াছ, বিবসনা না হইলে, লজ্জা ভয় মান সম্ভ্রম সমুদয় পরিত্যাগ না করিলে, তোমাকে পাওয়া যায় না। "লাজহীনা পবিত্রতা" কেবল তোমার মত দেবতা আদর করিতে জানে। লজ্জা পাপ হইতে। যে দিন মানুষ পাপে-

কলুষিত হইয়াছিল, সেই দিন কাপড়ে গা ঢাকিয়াছিল। আমি তাই হৃদয়ের বসন উন্মোচন করিয়াছি, গভীর অন্তস্তল পর্য্যন্ত দেখা যাইতেছে। দেখ সেখানে আর কেহ নাই—

অতিশয় বিজন সে ঠাঁই
কোলাহল কিছু সেথা নাই
বাহিরের দীপ রবি তারা
ঢালে না সেথায় করধারা
তুমিই করিবে শুধু দেব
সেথায় কিরণ বরিষণ।
কেবল আনন্দে বসি সেথা
মুখে নাই একটীও কথা
তোমারি পুরোহিত প্রভু
করিবে তোমারি আরাধন,
নিরবে বসিয়া অবিরল
চরণে দিবে সে অশ্রুজল
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা
মুদিয়া সজল দুনয়ন।

বঁধু এস এস, সেই অনাবৃত বুকের উপর মাথাটী রাখিয়া একবার শয়ন কর। দীপ্ত শিরার অভিষেক হোক। জ্বলিয়া পুড়িয়া বুকটা খাক হইয়া গেছে। তোমার অমৃতস্নাত শির স্পর্শে একবার শীতল হোক।

তুমি দেবতা, আমি মানুষ, তুমি রাজা, আমি প্রজা, তুমি ঈশ্বর, আমি দীনহীন। আমার আকাঙ্ক্ষাকে কি দুরাকাঙ্ক্ষা বলিবে? আমার বাসনাকে কি ধৃষ্টতা বলিবে? তুমি যে বলিয়াছ, সমানের ভালবাসায় তুমি সন্তুষ্ট নহ; তুমি

যে বলিয়াছ, তোমার চেয়ে যে নীচ তার ভাল বাসায় তুমি যত প্রীত হও, এমন কারো ভালবাসায় নহে। মুনি, ঋষি, যোগী, সাধু শান্ত সম্মানে সম্মানে সাম্য স্বাধীনতা মৈত্রীভাবে তোমার উপাসনা করে, তুমি নাকি তাদের চেয়ে দীনহীন সন্তানের উপাসনা ভাল বাস? সেই জন্য না তুমি গোয়ালার ঘরে মাখন চুরি করে খেতে? সেই জন্য না তুমি বামনের পাতের ভাত কুড়িয়ে খেয়ে ছিলে? বঁধু আমার ধৃষ্টতাই হউক, আর দুরাকাঙ্ক্ষাই হউক, আমি তোমাতে মজিয়াছি, তুমি আমাতে মজিবে, কখন আশা করি না। তবে আতুষী ফলের রঙে স্ফটিকের মত যদি একবার আমার রাগে অনুরঞ্জিত হও, তবেই আমার কুসুম জন্ম সার্থক হইবে। আমাকে সবে শ্যাম-সোহাগী রাধা কলঙ্কিনী বলিয়া গালিদেয়, দিক্, যদি রাধানাথ বলিয়া একদিনের জন্য তোমায় কেহ ডাকে, তবে রাধার ভাগ্যের গৌরবের সুখের সীমা থাকিবে না।

রাধানাথ, এ সুখের নিশি আকাশের চাঁদকে দেখাইয়া দেখাইয়া রাধার নীলাম্বরের উপর তোমার চাঁদ মুখখানি একবার শোভিত কর।

আমাকে জটিলা কুটিলা জিজ্ঞাসা করে, আমি কি দেখিয়া তোমাতে মজিলাম। কেন তোমাকে ভালবাসি। আমি কি পাড়াপড়সীর ভয়ে তোমাকে ভজিয়াছি? তোমার ঐশ্বর্য্য দেখিবার আশায় তোমাতে মজিয়াছি? তোমার রূপ দেখিয়া সোহাগ করিয়াছি? তুমিত আমার স্বামী নহ। কর্ত্তব্য বুঝিয়াও তোমাকে ভাল বাসি নাই। আমি কেবল রাগে তোমাকে বরণ করিয়াছি। আমার অহেতুকী ভালবাসা। তুমি লালসাময়ী বলিয়া পদাঘাত করিয়া তাড়াইয়া দাও, তবুও

তোমাকে ভাল বাসিব। তুমি সোহাগ করিয়া বুকে তুলিয়া লও, তবুও তোমাকে ভাল বাসিব, তুমি তিরস্কার গঞ্জনা কর, শত রমণী লইয়া আমার সমক্ষে বিলাস কর, আমাকে লাঞ্ছনা কর, তবুও তোমাকে ভাল বাসিব। রাধার মনোমোহন, রাধার আত্মা ও দেহ তোমাতে তন্ময় হইয়াছে। রাধা আর মান অপমান বুঝে না।

নহে ভাল হের, নিগড় করিয়া
রেখেছি চরণারবিন্দ।
কে বা নিতে পারে, নেউক আসিয়া
পাঁজরে কাটিয়া সিন্ধ॥

আমার মনের সহস্র বাসনা। হৃদয়বিহারী, হরি, সে সব কথা তুমি জান; কোন্ সাধ পূরাইবে, তুমিই বলিতে পার, অথবা এ জন্মের সাধ এ জন্মে আর পূরিবে না।

এ জনমের সঙ্গে কি মোর জনমের সাধ ফুরাইবে!
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে এ সাধ মোর পূরাইবে?

তোমার মনের কথা তুমি বলিতে পার। তাহা জানিতেও আমার ইচ্ছা নাই। আমার একটী আশা কেবল তোমাকে বলিয়া রাখি, ইচ্ছা হয় পূর্ণ করিও, ইচ্ছা হয় করিও না। আমি তোমার বিরহ আর সহ্য করিতে পারি না। দূরে দূরে থাকিয়া এক একবার মুরলী রবে প্রাণ পুরে না। "মাঝে মাঝে তব দেখা পাই চিরদিন কেন পাই না?" নিরাশা বিরহ নানা মেঘে তোমার মুখখানি ছাইয়া ফেলে, তোমার রূপে স্মৃতির পট মুছিয়া যায়। প্রাণের ভিতর সদাই আতঙ্ক, যেন তোমাকে হারাই হারাই—"হারাই হারাই—হেন সদা করে চিতে।" আজ আমার বুকের উপর এমন করিয়া দাগ করিয়া দাও, যেন

আর কখনও মুছে না। কলঙ্কিনী নাম ত হইয়াছে, এখন রাধা আর কাহাকে ডরে না।—কলঙ্কিনী করি খেয়াতি হয়েছে, আর কি কাহারে ডর? নূতন দাগে আর ভয় কি? নাথ বল, কি করিলে তোমাকে চিরদিনের জন্য পাইব,—"কি করিলে বল পাইব তোমারে, রাখিব আঁখিতে আঁখিতে।"

বঁধু, তবুও কটাক্ষের তীব্রতা ঘুচিল না? একটী কথাও বলিলে না, অভিসারিকা রাধিকা কি আজ প্রত্যাখ্যাত হইয়া ফিরিয়া যাইবে? রাধার চোখের অবিশ্রাম জলধারা আজিও কি ঘুচিবে না?

ভাগ্যে মিলয় ইহ শ্যাম রসবন্ত
ভাগ্যে মিলয় ইহ সময় বসন্ত
ভাগ্যে মিলয় ইহ প্রেম সাঙ্গাতি
ভাগ্যে মিলয় ইহ সুখময় রাতি
আজু যদি অভাগিনী তেজবি কান্ত
জনম গোঙায়ব একান্ত।

ঘুচিল না, ঘুচিবে না। চলিলাম, আবার দূরে, অতি দূরে চলিলাম। আমি বলিব না, "ক্ষুদ্র এই বনফুল পৃথিবী কাননে, কেন হে নিদয় হয়ে দলিলে চরণে?" আমি জিজ্ঞাসা করিয়া যাই, কুসুম দলনে, তোমার কুসুম সুকুমার চরণে ব্যথা পাও-নাই ত? অঞ্চলে চরণ মুছাইয়া যাই। বুঝিলাম—

"প্রাণের বাসনা হেথায় পূরে না"।

দগ্ধ মরুভূমে যে আশ্রয় ছায়া পাইয়াছিলাম, এত দিনে তাহাও ঘুচিল, এখন—

"শ্যাম শ্যাম শ্যাম বলে, পশিব যমুনা জলে
ত্যজিব কালিন্দী নীরে প্রেমদার একজীবন।"

"প্রতিপদমিদমপি নিগদামি মাধব
তব চরণে পতিতাহং
ত্বয়ি বিমুখে ময়ি সপদি সুধানিধিরপি
তনুতে তনুদাহং।"

অমৃতে যার গরল উঠে, মরণ ভিন্ন তার আর কিসে ভরসা আছে? সেই এক দিন আর এই এক দিন।

---

# লালসা ও বিরহ।

আলোর দুদিকে আঁধার! দিনের দুপাশে রাত। এক দিকে লালসা, অন্য দিকে বিরহ, মধ্যে সম্ভোগ। আঁধার না থাকিলে আলোর জ্যোতি ফুটিত না।

তাপ শ্রীবৃদ্ধির হেতু, তাপে না পুড়িলে গাছ-পালা বাড়ে না, কেবল জল ছিটাইলে, হাওয়া দিলে সার যোগাইলে, গাছ মরিয়া যায়। মাঝে মাঝে রোদ খাওয়াইতে হয়। বিরহ প্রেমের রৌদ্র, লুণ কটু কিন্তু ব্যঞ্জনে না দিলে ব্যঞ্জনের রস হয় না। বিরহ প্রেমের লবণ, যাহার প্রেমে বিরহ হয় নাই, বন্ধুতায় বিচ্ছেদ হয় নাই, সে প্রেমের সরসতা অনুভব করে নাই। চাহিলেই যে পায় তাহার পাওয়ায় সুখ নাই, সে প্রাপ্ত দ্রব্যের মূল্য বুঝে না, দেখিতে চাহিলে যে দেখিতে পায়, তাহার দেখিয়া সুখ হয় না। যাহাকে কষ্ট করিয়া দেখিতে যাইতে হয়, জগবন্ধু "দেখা দেও আমায়, বলিয়া বনে জঙ্গলে কাঁদিতে কাঁদিতে যাইতে হয়, যাইয়া পঁহুছিলে দু চারিবার দেখা না পাইয়া ফিরিয়া আসিতে হয়, যাহাকে দেখিয়াই আবেগে দাঁড়াইয়া কাঁপিতে হয়, দাঁড়াইয়া কাঁপিবার অপেক্ষা ধৈর্য্য সংগ্রহের জন্য যাহাকে সাধ করিয়া পলাইতে হয়, পিপাসায় প্রাণ শুকায় অথচ কাছে যাইতে যাহার প্রাণ কাঁপে, তাহারই দেখিয়া সুখ। এজন্য বিরহ।

পদ দুই চারি চলত পুন ফিরই।
ভীতহি কম্পিত অঙ্গ।
ঐ পুন ভাতি আওল যাহা মাধব—
দূরহি রহ পুন থারি।

অদ্ভুত মনোহি বিলাসন উন্মুখ
ভরহি-নয়ন ঝরু বারি॥

বিরহে সাথী চাই, একার বিরহ বড় কষ্টকর। সুখে ত সখীর আবশ্যক, দুঃখেও সখীর আবশ্যক। সখী আপনার সুখ চাহে না। সখীর সুখেই সে সুখী, সখীর দুঃখেই সে দুঃখী, কুঞ্জবনে শ্যামের সঙ্গে রাধিকার মিলন হইলে তাহার প্রাণ শীতল হয়। সখীর সুখ দেখিবার জন্য সে মাঝে মাঝে উঁকি ঝুঁকি মারে বটে, কিন্তু সাধারণতঃ সে যমুনার তটে যাইয়া চাঁদের আলোয় বালুতে শুইয়া যমুনার হিল্লোল গণে।

তবহুঁ সফল দিন মোর।
রাই সুতব যব কানুক কোড়॥
হাম পৈঠব কালিন্দি বারি।
যবহুঁ পুরব মনোরথ তোহাঁরি।
যতন করব হাম সোই।
কানু যে তুয়া বশ হোই॥

রাধার দুঃখে সখীর দুঃখ রাধার অপেক্ষা অধিক। দুঃখিনী রাধাকে নিজের দুঃখ ভুলিয়া সখীর চোখের জল মুছাইতে হয়, তাহাকে প্রবোধ দিতে হয়।

নিজ সখী বদন হেরি,
সুধামুখী বুঝি কহে গদ্‌গদ বাত।
রসিক সুনাহ মোহে যদি উপেখল,
তুহু কাহে তাপসি গাত—
মঝুলাগি যতন করলি দুঃখ পায়লি,
দৈবহি যদি নহ কাজ।

তুঁহু কাহে বিরস বদন ঘন রোয়সি,
কিহে পুনঃ করলি অকাজ ॥

এমন সখী পাইলে বিরহের তীব্রতা ক্ষীণ হয়। সে বড় হতভাগ্য, যাহার চোখের জল মুছাইবার কেহই নাই। সে আরো হতভাগ্য, যে চোখের জল ফেলিতে পারে না, বুকের নিশ্বাস বুকে বুকে যাহাকে লুকাইয়া রাখিতে হয়।

দাসীর সেবা স্বার্থ হেতু। সখীর ভাল বাসায় স্বার্থ নাই। অথবা তাহার ভাল বাসিয়াই সুখ তাই সে ভাল বাসে। তাহার ভাল বাসায় এত টুকু স্বার্থ আছে। তাই সখীর ভালবাসা দাসীর ভালবাসার উর্দ্ধে স্থাপিত হইয়াছে। জগতের যাবতীয় ধর্ম্ম দাসী ভাব অতিক্রম করিতে পারে নাই। তুমি প্রভু আমি দাস, ধন দেও, পুত্র দেও, তোমার সেবা করিব। না হয় স্বর্গ দেও, না হয় মোক্ষ দাও। দাও কিছু, দাতব্যে তোমাকে ভাল বাসিতে পারি না। ভাল বাসার বিনিময়ে বেতন চাই; জগতের সমস্ত ভাল-বাসাই এই ভাবে পূর্ণ। সব বেনের ব্যবসা।

কোথা হইতে কোথায় আসিয়াছি। বলিতে ছিলাম, যে, সম্ভোগের এক দিকে লালসা, অন্য দিকে বিরহ। বিরহ প্রেম দাঁচাইয়া রাখে, লালসায় সম্ভোগ পূর্ণ হয়। লালসা পশুভাবে পূর্ণ। পশুর লালসার মত লালসা হইলে, তবে পূর্ণ সম্ভোগ হয়।

লালসার আরম্ভ নদীর আরম্ভের মত সূত্রবৎ। অতি সামান্য কারণে উৎপন্ন হয়। রাধিকা শ্যামকে দেখেন নাই। মুরলীর রব শুনিয়া রাধার লালসা আরম্ভ হইয়াছিল। যে ভগবানকে দেখিয়া তাহার পর ভাল বাসিতে চায়, তাহার মুক্তি লঘুতর।

মুরলী শুনিবার পরে সখীর মুখে তিনি শ্যামের রূপগুণের বর্ণনা শুনেন। তাহার পর সখীর প্রণীত চিত্রপটে সে রূপ নয়নগোচর করেন। এই হইতে রাধিকা লালসার উদ্বেগে পাগলিনী হন।

কদম্বের বনে থাকে কোন জনে
কেমনে শবদ আসি।
একি আচম্বিতে শ্রবণের পথে
মরমে রহল পশি॥
সান্ধায়া মরমে ঘুচায়ে ধরমে—
করল পাগরি পারা।
চিত স্থির নহে স্বাস্থ্য নাই রহে—
নয়ানে বহয়ে ধারা॥

শ্যামের বাঁশী শুনিয়া পাগল হয় তার মত ভাগ্যবতী ভারতে কে? কৃষ্ণের শ্যামরূপ সুতরাং—

আকাশ নব জলধর হেরি,
সোই ধনি কাতরে করু পরলাপ।
নীলাম্বরে অবশ হই না পরই,
অরুণাম্বরে তনু ঝাঁপ।
সহি না চিনই কাল কি গৌর।
জলদ নেহারি নয়নে ঝরু লোর॥
পতিকর পাশে জানই জঞ্জাল।
বিজনে আলিঙ্গই তরুণ তমাল॥

কোথা শ্যাম চন্দ্র কোথা তরুণ তমাল। সুখের কারণে শ্যামের অভাবে শ্রীরাধিকা শ্যামরূপ তরুণ তমালকে বিজনে আলিঙ্গন করেন। এমন উন্মাদিনী লালসা না হইলে সম্ভোগে

সুখ কি? চিত্র পরিবর্ত্তন কর। বলিবে রাধা রমণী বলিয়া লালসার বেগ সংযত করিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীকৃষ্ণের লালসা দেখুন।

রাধা কনক চম্পক দাম গৌরী সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ,

চম্পক দামে হেরি চিত অতি কম্পিত,
লোচনে বহে অনুরাগ।
তুয়ারূপ অন্তরে জাগয়ে নিরন্তর,
ধনি ধনি তোহারি সোহাগ॥

রাধানাম মুখে উচ্চারণ করিতে শ্রীকৃষ্ণের সামর্থ্য নাই—

রা—কহি—ধাপঁহু—কহই না পারই,
ধারা ধরি বহে লোর।
সোই পুরুষ মণি লোটায় ধরণী,
গুণিকা কহ আরতি ওর॥

রাধা বিজনে নবীন তমাল আলিঙ্গন করিতেন, শ্রীকৃষ্ণ তেমনটী কোথায় পাইবেন? যজ্ঞে স্বর্ণময়ী সীতা চলে, প্রেমে চলে না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ—

কাঞ্চন যুথি কুসুমময় গোরি।
নিরমই মুরতি যতন করি তোরি॥
তুয়া অনুভাবে আলিঙ্গই তায়।
সো তনুতাপে ভসম ভই যায়॥

এই কয়টী কথায় কবি প্রতিমা পূজার সমস্ত রহস্য উদ্ঘাটন করিয়াছেন।

আবার দেখুন।

শীতল পীত নিচোল।
তোহারি ভরমে করু কোড়॥

সো রস পরশ না পাই।
মূরছিত ধরণি লোটাই।

কাহার লালসা বেশী? রাধিকা তমালে সুখ না পাইয়া মূর্চ্ছিত হন নাই। শ্রীকৃষ্ণ পীত বস্ত্র বুকে জড়াইয়া যখন রাধা আলিঙ্গনের সুখ অনুভব করিতে পারিলেন না, তখন মূর্চ্ছিত হইয়া ধূলায় লুটাইতে লাগিলেন। যেমন লালসা তেমনি সম্ভোগ; যেমন সম্ভোগ, তেমনি বিরহ। ভগবানের সহিত রতিরস সম্ভোগ করিতে এমন লালসা কয় জনের হইয়াছে। নিবৃত্তি পথে এমন লালসা নাই।

মানুষ যখন সকল রস আস্বাদন করিয়া মধুর রস সাগরে অবগাহন করে তখনই তাহার নিবৃত্তির আরম্ভ হয়, সকল বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন করিলে তবে পরাবৃত্তি কর্ষণের শক্তি জন্মে। যে এখন সখী'ভাব সাধন করে নাই সে ত দূরের কথা, যে এখন ভাল বাসিতে শিখে নাই, তাহার আবার ধর্ম্ম কি? ধর্ম্ম যদি সহজ হইত, জগতে অধার্ম্মিক থাকিত না।

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তিতে কত প্রভেদ, একটী কর্ম্মে, অন্যটী জ্ঞানে, একটী নরকে বা স্বর্গে, অন্যটী মোক্ষে লইয়া যাইবার পথ। অনেকে প্রবৃত্তিকে কর্ষণ বিনা শুখাইয়া মারিবার পরামর্শ দেন, প্রবৃত্তি তিরোভূত হইলে নিবৃত্তিমার্গে সঞ্চরণের ক্ষমতা জন্মে। বেদান্ত ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের এই উপদেশ। কিন্তু বৈদান্তিক ও বৌদ্ধ, প্রবৃত্তি পরাজয়ে পরাস্ত হইয়াছেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ সম্পূর্ণ বিপরীত। রাগ মার্গে সম্যক্ অগ্রসর হইলে বৈরাগ্যের সম্ভাবনা সহজ।

কৃষ্ণ আকর্ষণ করেন ও আকর্ষিত হন। ভগবানকে বৈষ্ণবেরা প্রবৃত্তি পরিচালিত বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। সর্ব্ব

প্রবৃত্তির মধ্যে প্রবলতম যে বৃত্তি, তাহারই কর্ষণে পরামর্শ দিয়াছেন। প্রভুর প্রতি ভৃত্যের, গুরুর প্রতি শিষ্যের, পিতার প্রতি পুত্রের যে ভাব, সে ভক্তিকে অতিক্রম করিয়া, স্ত্রীর মত স্বামীর সঙ্গে—স্ত্রীরও বুঝি স্বামীকে বড় বলিয়া একটা ভয় থাকে তাই, উপপতির সহিত উপপত্নীর মত রমণ করিতে শিখাইয়াছেন।

ইউরোপীয়েরা পৃথিবীর মানচিত্র অঙ্কিত করিয়া স্পর্দ্ধা করেন। বৈষ্ণবেরা মানুষের মনের মানচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। এমন দার্শনিক জগতে দুর্ল্লভ। কোন পথে কোথায় যাওয়া যায়, তিমির-প্লাবিত অতি অন্ধতম পথ তাঁহারা দেখাইয়া দিয়াছেন। রাগমার্গে কিরূপে বৈরাগ্য লাভ হয়, কাম কর্ষণে কিরূপে নিষ্কামতা জন্মে, পরদারপরায়ণ হইয়া কিরূপে মোক্ষ লাভ করা যায়, এই বিষম সমস্যার মীমাংসার নাম বৈষ্ণব-দর্শন। সে জ্যোতিতে চক্ষু ঝলসিবার ভয়ে দেবগণ চক্ষু মুদিত করেন। ঋষিগণ আতঙ্কিত হন। সে সাধনের নিকট পঞ্চতপা অকিঞ্চিৎকর।

রাগরস প্রভৃতি বিদ্রূপ মাত্র, সে মন্ত্র না জানিয়া সাপ খেলাইতে যাইয়া কালকূটে ভারত সমাজ জর্জ্জরিত। পরিণামে বেদান্ত, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ধর্ম্ম সমাবস্থ। বিষ জরাইতে জানে কয় জন, কিন্তু খাইতে চায় যে সকলে, উপায় কোথায়?

# সুখ।

যখন জানিতাম না আমি সুখী না দুঃখী, তখন আমি সুখী ছিলাম। যখন জানিলাম আমি সুখী, তখনই বুঝিলাম আমি দুঃখী। সুখ অন্ধ, দুঃখ জ্ঞানী। জ্ঞানের উৎপত্তি দুঃখে, দর্শন বিজ্ঞান বিষাদের ইতিবৃত্ত।

যখন সুস্থ ছিলাম, তখন জানিতাম না স্বাস্থ্য অস্বাস্থ্য কাহাকে বলে। তখন যত হাত পা শরীর ছিল কি না, জানিতাম না। ইচ্ছা হইত, লাফাইতাম, ছুটিতাম, হাতের সঙ্গে তখন পরামর্শের আবশ্যক হয় নাই।

সত্য যুগে জ্ঞান বিজ্ঞান দর্শন উপনিষদ ছিল না। কারণ তাহারা তখন সুখী। তাহারা শরীর চিরিয়া হাড় গণিবার আবশ্যকতা বুঝে নাই। যে যত দুঃখী, সে তত জ্ঞানী। পশ্চিম দেশীয় পণ্ডিত শরীরের ভূগোল রচনা করেন, পূর্ব্ব দেশীয় পণ্ডিত সহস্র সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মনের ভূগোল রচনা করিয়াছিলেন। তখন তাহাদের দুঃখের পরাকাষ্ঠা। পশ্চিমেরা এখনও আমাদের অপেক্ষা সুখী। তাই আমাদের মত জ্ঞানী নহেন।

জ্ঞানে সুখ না অজ্ঞানে সুখ? যে সুখী সে জ্ঞানী? সে কি জানে সে সুখী?

একদিন ছিল যখন দুজনে কত গল্প করিতাম। যখন দুজনে কত খেলিতাম, কত বেড়াইতাম, চাঁদের আলোকে দুজনে দুজনাকে দেখিয়া হাসিতাম, চুলের রাশি ধরিয়া টানিতাম। তখন জানিতাম না যে তোমাকে ভাল বাসিতাম। কিন্তু তখনই তোমাকে প্রকৃত ভাল বাসিতাম, তখনই কেবল

মরিতে বলিলে মরিতে পারিতাম। কারণ তখন জানিতাম না যে, তোমাকে ভাল বাসিতাম। যে দিন জানিলাম যে তোমাকে ভাল বাসি সে দিন অর্দ্ধেক ভালবাসা ফুরাইয়াছে। তাহার পর যে দিন তোমার কাছে সে কথা ফুটিলাম,—সে দিন বার আনা শেষ হইয়াছে। তাই মুখে লালিমা, আধ আধ কথা, মাথা হেট, এই সকল পরের ঘরে ধার করিয়া সে বার আনা পূরাইতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। কিন্তু তখনও কিছু ছিল। যে দিন সাত গাঁয়ের লোক এক করিয়া সবার সাক্ষাতে বলিয়া ছিলাম "তোমা বই আর জানি না" সে দিন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলিয়া ছিলাম, তখন ষোল কড়াই কাণা হইয়া গিয়া ছিল। কেবল খাতিরে পড়িয়া সংসারের বন্ধুর ক্ষেত্রে গড়াগড়ি দিবার জন্য দুজনে ছড়া বাঁধিয়াছিলাম। কথাটা বড় কটু কিন্তু বড় সত্য। ভাব ফুটিতে গেলেই কিছু পরিমাণে মিছা হইয়া যায়।

জ্ঞান অক্ষরে ফুটে, ভাব অক্ষরে ফুটে না, অক্ষরে যাহা ফুটে সেটা পোষাক শরীর নহে। ভাব ফুটে কিছু সুরে, সেও গোপনে। রবির ছায়ার চেয়ে কায়াটা অনেক ভাল। কবির বাক্য যাহা পড় সেটাত উদ্গার, যেটা পড়িতে পার না সেইটাই আসল কবিতা। সেটা কবির হৃদয়। গাছ পালা বড় সুন্দর। লতা পাতা বড় সুন্দর। নীলাকাশে শরৎশশী, নীল পত্রে শ্বেত কমল, নীল মণ্ডলে তারার মালা, বড় সুন্দর বড় সুন্দর। কিন্তু তারাও কি কবির হৃদয়ের পরিচয় দিতে পারে? তিনি যাহা পারিলেন না, তুমি তাহা পারিবে?

এই জন্যইত ভাবুকেরা পাগল হয়। মনের ব্যথা বলিতে পারিলে কম কষ্ট হয়, মনটা খালি হয়। কিন্তু যার ব্যথা, সে

কি ফুটিতে পারে? সোণার বেনে ব্যথার আধলাটা বাজারে ফেলে দিয়া বিনিময়ে প্রাণটা পুরা করিতে পারে। কিন্তু যার ব্যথা—ব্যথার মত ব্যথা, সে কি তাহা ফুটিতে পারে? তার ব্যথাও পবিত্র দেবতা, আঁধারের আঁধারে সে তা লুকিয়া রাখে। শেষে পাগল হয়। তা না হলে কি গৌরাঙ্গ সাগর জলে ঝাঁপ দিতেন। তা না হলে কি রাধিকার কোকিল কূজনে মুরলী ভ্রম হইত? ব্যথিত যাহা ফুটে তাহা প্রলাপ, তাহা ঠিক হয় না। কাকে মারতে কাকে মেরে বসে।

দুঃখের ব্যথা যখন ফোটা যায় না, তখন সুখের কথা কি ফোটা যায়? হরি হরি! সুখের যে কথাই নাই। সুখের অনুভাবকতা নাই। সাদা আলো কি দেখাবার? যখন রঙ্গিন চসমা দিয়া দেখ, তখনই সে সাদার ভিতর কি আছে তা বুঝিতে পার। দুঃখের ভিতর সুখের অনুভূতি নাই। দুঃখের ভিতর যখন সুখের অনুভূতি হয়, তখন সুখ অতীত হইয়াছে। পরের মুখে শোনা কথার সাক্ষ্য গজভুক্ত কপিত্থবৎ।

সুখের সময় সুখের প্রতীতি করিলে মানব জীবনের বৈচিত্র্য থাকিত না। গোলাপ সুন্দর হইলেও তোড়ায় ছটা পাতার বেড় দিতে হয়। সুখের সময় সুখের প্রতীতি থাকিলে মানুষের ঝগড়া ঘুচিত না। স্তনের মধুরতা তখন বুঝিলে কি মায়ের স্তন ছাড়িয়া চুষি ধরিতাম? সে অভয় কোল ছাড়িয়া কে ধীরে ধীরে পায় পায় উঠানে নামিত?

আর আমি? সে সময় যদি জানিতাম তোমাকে ভালবাসি, তা হলে কি আজ এ অন্তর্জ্জালায়, দিবা নিশি, নিশি দিবা জ্বলিতে হইত? তা হলে কি যে কিছু গান গাই, তাহাতেই সেই এক সুর দেখা যাইত?

আসল যার মিলে না তার ঝুটা বড় সস্তা। টাকায় এক সের হীরা, ও এক হাজার মুক্তা বালাখানায় কিনিতে পাওয়া যায়। ভাবের ভণ্ডামী ষোল আনা, ভাবুক কয়জন মিলে? ভাব ফুটে না, কিন্তু ফুটন্ত ভাব—নামের ছাপও প্রিয়তম, বাঁকা দৃষ্টি ও নথ খোঁটা, রুজও পরচুল দোকানভরা। রাধিকা একটী। যাকে দেখিলে শত পদ্ম ফুটে, তার মত দুর্ভাগ্য কে? আর তার মত দুঃখী কে যে আপনাকে সুখী বলিয়া পরিচয় দেয়? সুখ বোঝা যায় না, দুঃখই বোঝা যায়, যে আপনাকে সুখী বলিয়া বুঝে সে বুঝিল কি? অথচ কাঁদে লক্ষে একটী, হাসে লক্ষজন। হাসি নাকি ঝুটা তাই এত সস্তা। একদিন একটী বালকের দুইটী চিত্র দেখিয়াছিলাম, একটী হাসিতেছে, আর একটী কাঁদিতেছে। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোনটী সুন্দর? তুমি বলিয়াছিলে, যেটী কাঁদিতেছে।

সে হা করিয়া কান্না নহে, চীৎকার করিয়া কান্না নহে। যে রোদনের অঙ্গভঙ্গী গলাবাজী আছে, সে ঝুটা রোদন। তাতে গভীরতা নাই, পবিত্রতা নাই, মোহিনী শক্তি নাই। তা বুকে পূরিয়া রাখিবার জিনিস নহে, রাস্তায় ফেলিয়া দেখিবার জিনিস। আর এক দিন আর একটী শিশুর দুটী চিত্র দেখিয়াছিলাম। একটী জাগ্রত, আর একটী সুষুপ্ত। তোমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, কোনটী সুন্দর? তুমি বলিয়াছিলে সুষুপ্তটী, সুষুপ্তি বিষাদের পরিণতি, হাসি জাগ্রত বৃক্ষের ফুল। গভীরতা পবিত্রতা সম্মোহকতার ছবি সুষুপ্তি। হাসি ও জাগরণ-বিকার বিপ্লব ও প্রলাপ। প্রাণের আকুঞ্চন, জীবনের তুফান, সংসারের ঝটিকা। জ্ঞানী জাগ্রত, সুখী সুষুপ্ত। জ্ঞানীর শয্যা কণ্টকিত তাই সে জাগ্রত। যখন বুকের উপর মাথাটী দিয়া

পড়িয়া থাকিতাম তখন চক্ষু চাহিত না, কে যেন নিমীলিত করিয়া দিত। সে নিদ্রায় স্বপ্ন ছিল না, জানিতাম না জাগিয়া থাকিতাম কি ঘুমাইতাম। নতুবা বলিতে পারিতাম, কতক্ষণ অতিবাহিত হইয়াছিল।

এখন বয়স হইয়াছে, প্রবীণ হইয়াছি। তাই নিদ্রা পলায়ন করিয়াছে। দিবসে ও রাত্রিতে কত মুহূর্ত্ত, সব গণিয়া বলিতে পারি। এখন জ্যোতিষী হইবার সুবিধা হইয়াছে। দুঃখী ব্যক্তি এত জাগিয়া থাকে বলিয়া তাহার বিজ্ঞান চর্চ্চার সুবিধা হয়। ছিলাম কবি, হইতেছি বৈজ্ঞানিক। যখন কবি ছিলাম তখন জানিতাম না, এখন জানিয়াছি। এখন বৈজ্ঞানিক হইতেছি তাহা এখনই বুঝিতে পারি। সুখে সুখের প্রতীতি হয় না কিন্তু দুঃখে দুঃখের প্রতীতি হয়।

নতুবা দুঃখ মোহে লোকের উদ্যম জন্মিবে কেন? রোগের সময় রোগী যদি রোগ না বুঝিত, তবে রোগের প্রতিকার হইত না, রোগে প্রাণান্ত ঘটিত। ভাবুকের উন্মত্ততা ও রোগীর রোগ প্রতিকার চেষ্টা উভয়েই সজীবতা আছে, কিন্তু একটীতে জ্ঞান নাই, আর একটীতে জ্ঞান আছে। একটী সুখ, অন্যটী দুঃখ। একটীতে উপভোগ, অন্যটীতে প্রতিকার। যে কারণে সুখের সময় সুখের প্রতীতি জন্মে না, ঠিক সেই কারণেই দুঃখের সময় দুঃখের প্রতীতি জন্মে।

বিজ্ঞান ও দর্শন চিকিৎসা শাস্ত্র,মানব জীবনের ব্যাধি পরিহারের সন্ধান। কোনটী পূর্ণ নহে, কোনটীতে আশা পূর্ণ হয় না। জ্ঞানের সূত্র দুঃখে, জন্ম, বৃদ্ধি, পরিণতি দুঃখে। সুখের বিজ্ঞান নাই। যাহার প্রতীতি নাই, ভাব পরীক্ষা, পরিদর্শন ব্যবচ্ছেদ ও ব্যবস্থা নাই,তার আবার বিজ্ঞান কি করিয়া হইবে?

সুখের যখন প্রতীতি নাই, বিজ্ঞান নাই, পরের মুখে সুখের শোনা কথার যখন সাক্ষ্য লইতে হয়, তখন সুখ আছে বা ছিল বা হইবে তাহার প্রমাণ কি?

প্রমাণ কিছুই নাই, আজীবন যে অন্ধকারে সূর্য্যের আলোক আছে, তার প্রমাণ কি? যখন সকলে ম্যালেরিয়া প্রপীড়িত, তখন সুস্থ লোক আছে তাহার প্রমাণ কি? যখন সকলেই অন্ধ তখন চক্ষুষ্মান্ লোক আছে, তাহার প্রমাণ কি? বস্তুতঃ কোনও প্রমাণ নাই, যা কিছু আছে, তোমার এই প্রতারণা পূর্ণ হাস্যে, তোমার এই গভীর নিরাশার কঠোরতম প্রশ্নে। সুখ পাইয়াছি এক দিন ইহা জানি, আর প্রমাণ নাই, সুখী হইব আর এক দিন ইহা বিশ্বাস করি আর কোন প্রমাণ নাই। "We may be happy yet" প্রাণের উপর এ কথাটা লেখা আছে।

---

# শ্যামের বাঁশী।

শ্যামের বাঁশী যে কত মধুর, তা শ্যামসোহাগিনী শ্রীমতী ভিন্ন আর কে বুঝিতে পারে? কে বলিতে পারে? সৈকত-বাহিনী শ্যামসলিলা যমুনা, শ্যাম লতা পল্লবে শোভিত মঞ্জু নিধুবন, আর বন মালা কণ্ঠিত পীতবাস শ্যাম সুন্দর না হইলে, আর কোথাও, আর কাহারও হাতে মুরলীর যেমন শোভা হয় না, প্রেমবিহ্বলা ব্রজগোয়ালিনী ভিন্ন আর কেহ তেমনটী বুঝেও না। শ্যামের সঙ্কেত বাঁশী বাজে অনেকের জন্য, কিন্তু তেমন করিয়া শুনে কয় জন? গুরুজনার মাঝে বসিয়া বাঁশীরব কানে আসিলে, ছুটিয়া রাজপথে বাহির হইতে কয়জন পারে? গভীর তমিস্রা নিশীথে, নব নব কুশাঙ্কুর জর্জ্জরিত বনপথে, আর কে বাঁশীর রব শুনিয়া লজ্জা ভয় তেয়াগিয়া, প্রাণের মমতা না করিয়া বনে বনে ধাইতে পারে, রণপণ্ডিতা চন্দ্রাবলি চরণ কলঙ্কিতের কলঙ্করাশি আর কে একবার বংশী রবে বিস্মৃত হইতে পারে, আর কে যমুনা পুলিনে শ্যামের আদেশে গাত্র বস্ত্র উন্মোচন করিতে পারে, আর কে তরঙ্গসমাকুল যমুনা বক্ষে স্বামী সংসার পরিত্যাগ করিয়া শ্যামের সঙ্গে জীর্ণ তরি আরোহণ করিতে পারে? কোন রন্ধ্রে বাঁশী কি বলে, তা রাধিকাই বুঝিতেন, আর কখন কোন রন্ধ্রে বাজাইতে হইবে তা রসময় রাসবিহারী ভিন্ন আর কেহ জানিত না। রাসেশ্বরী রাধিকা ও রাসবিহারী শ্যাম সুন্দর সাধে কি ভারতে একাধিপত্য স্থাপন করিয়াছেন।

ক্ষীর দুধের ব্যবসা করিলে প্রাণটা বুঝি সরস হয়। গোয়ালিনীর রসিকতা সকল দেশে বিখ্যাত। অথবা বিশাল মাঠের নির্ম্মল বায়ু বুকটা বুঝি বিস্তৃত করিয়া দেয়। নাপিতের মেয়ের

চতুরতা যেমন বিখ্যাত, গোয়ালিনীর সরসতা তেমনি বিখ্যাত। ক্ষীরের ব্যবসায়ে গোয়ালিনীর সরসতা জন্মে, ফুল মালা বেচিয়া মালিনী মধুর মধুরত্ব অনুভব করিতে পারে। যার যেমন ব্যবসা তার তেমন গুণ, এটা শাস্ত্রসিদ্ধ কথা। তা না হোলে কসাইরা এত নিষ্ঠুর হয় কেন?

গোয়ালিনীর সরসতা যেমন সরলতাও তেমনি। সরলস্বভাব ধেনু বৎসের সংসর্গে, খোলা মাঠের খোলা বায়ুতে সরলতার সঞ্চার হয়। চাতুরী প্রবঞ্চনার জন্ম আবদ্ধবায়ু বাঁকাপথ নগরে। মাঠে চাতুরী নাই। গোয়ালার মাঠে ঘর, সঙ্গে ধেনু, ব্যবসা দুধের। তার যেমন সরলতা, মালিনীর তেমন নহে। মালিনী ফুলের ব্যবসা করে কিন্তু নগরে।

সরসতা ও সরলতার উর্ব্বর ক্ষেত্রে প্রেমের বীজ অতি সহজে অঙ্কুরিত হয়। চাতুরীর কঠোরতায় বীজ শুকাইয়া যায়, ফাটে কিন্তু ফুটে না। ব্রজগোয়ালিনী বড় সুন্দরী। জহরী জহর চেনে। সুন্দরে সৌন্দর্য্যের অনুভাবকতা শক্তি প্রখরতর। প্রেমের আরম্ভ রূপ দেখিয়া। তখন তাহার নাম মোহ।

নাম রূপ, জগতের আদি অন্ত এই খানে। এই লৌহ-শৃঙ্খলের পরিধি মধ্যে আশার জন্ম, ব্যাপ্তি ও পরিণতি। দুর্ব্বল মনুষ্যের দুর্ব্বলতার এই লক্ষণ। সবাই এই বর্ণপরিচয়ে বিদ্যা সাঙ্গ করে। রূপ আদিতে থাকিবে সত্য, কিন্তু মানুষ যে রূপকে অনন্ত করিয়া লয়। মাটীর পুতুলে হরিতাল মাখাইয়া আরম্ভ করিয়াছিলে, কল্পনার কুসুমে বাক্যের অবয়বে পূজা সাঙ্গ করিলে। মনুষ্য এই পরিধির বাহিরে যাইতে পারিল না। সহস্র নাম সাধারণ করিয়া একটী নাম রাখিলে। রাম

শ্যাম জনার্দ্দনকে মানবে পরিণত করিলে; না হয়, মানব, বৃক্ষ, পশু, পক্ষী সকলকে একত্র করিয়া বিশ্বে পরিণত করিলে; না হয় জড় ও চিন্ময় পদার্থ একত্র করিয়া ব্রহ্মে পরিণত করিলে; তাহার পর? আরত উঠিতে পারিলে না, মাথা ঘুরিয়া পড়িল, কলৌ নাস্ত্যেব কেবলং বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিলে।

রূপ দেখিয়া ভাল বাসিলাম, রূপ ছাড়িয়া গুণ ধরিলাম, রূপ গুণ ছাড়িয়া নাম ধরিলাম। পৌত্তলিকতা হৃদয় হইতে দূর করিলাম, প্রাণের প্রতিমা খানি কাঁদিতে কাঁদিতে বিস্মৃতি সাগরে ডুবাইলাম, সেরূপ কিন্তু বিশ্বরূপে জড়াইলাম। তখন তাঁহার মধ্যে বিশ্ব সংসার দেখিতাম, এখন বিশ্ব সংসারে কেবল তাঁহাকেই দেখি। ইহা উন্নতি বটে, কিন্তু তবুত রূপ। বিশ্ব ছাড়িয়া, রূপ অতিক্রম করিয়া, তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম কৈ।

তুমি আরো আগে চলিয়াছ, রূপটী ভুলিলে কিন্তু নামটী সার করিলে যে? সেই নামে লোমকূপে তড়িতের ন্যায় স্ফুলিঙ্গ বাহির হয়, পাগল হইয়া পড়, সে নামটী ছাড়িয়া অগ্রসর হইতে ত পারিলে না। যে পৌত্তলিক সেই পৌত্তলিক রহিয়া যাইলে, গাদ কাটিয়া একটু বেশী সাফ হইলে মাত্র। অরূপ বুঝিয়া রূপ ভুলিয়া অরূপ নির্গুণ অলক্ষ নামে আত্ম পর্য্যবসিত করিলে। মনুষ্য কি এ দুর্ব্বলতা অতিক্রম করিবে না, দেহ কাটিয়া, লিঙ্গ কাটিয়া, তৎসং ক্লীব রূপে দাঁড় করাইলে, শেষে সেই ক্লীবের গলায় মালা দিয়া শাঁক ঘণ্টা বাজাইয়া কেশব চন্দ্র সেনের এত বুদ্ধি কাদায় লুটাইয়া পড়িল। অগষ্ট কোমত কুমারী পূজা করিলেন। বৈদান্তিক নির্গুণতাই গুণ বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেন। বৌদ্ধাচার্য্য নাম রূপেই সর্ব্বনাশ বলিয়া স্বীকার করিলেন।

সে কথা থাক্। ব্রজগোয়ালিনীর কথা বলিতেছি। ব্রজ-গোয়ালিনীর সরসতা ও সরলতার সহিত সৌন্দর্য্য-অনুভাবকতা শক্তি ছিল; মদনমোহন পরম সুন্দর। রূপজ মোহে গোয়ালিনী পাগল হইল। সঙ্গে সমবয়স্কা আরো অনেকে। সহানুভূতি মিলিল, ভাবের ঢেউয়ের উপর ঢেউ উঠিতে লাগিল। সাধুগণের সঙ্গত হইল। সঙ্গত না হইলে কি ভাবের জমাট বাঁধে?

তারাও সুন্দরী, তারাও যুবতী। একটু ঈর্ষাও জন্মিল, ক্ষুরে শাণ দেওয়া হইল। ভয় না থাকিলে সুখের সরসতা জন্মে না। তাই পরকীয়া না হইলে নায়িকা সিদ্ধি ঘটে না। বাইবেলেও লিখিয়াছেন Stolen fruits are sweet, breads eaten in secret are pleasant, তাই রাধিকা পরকীয়া, ঘরে স্বামীর ভয়, শাশুড়ী ননদিনীর ভয়, লোক ভয়, সমাজ ভয়, আবার সে সঙ্গে সতীনের ভয়। চন্দ্রাবলী রতিরণপণ্ডিত।

ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজন হইল। এমন সময় শ্যামল যমুনার সৈকত পুলিনে নীপ তরুতলে শ্যামের মুরলী ষড়জস্বরে বাজিয়া উঠিল। গোয়ালিনীর সরল সরসী প্রাণে ঢেউ লাফাইয়া উঠিল, স্বামী সংসার ছাড়িয়া ছুটিল; স্পর্দ্ধা করিয়া ননদিনীকে বলিয়া দিল যে, ঘরে যাইয়া বলিও, রাজনন্দিনী রাধিকা কৃষ্ণ কলঙ্ক সাগরে ডুবিয়াছে। যে পর হৃদয়ে বাস করে তার আর অন্য বাসে প্রয়োজন কি? প্রেম সম্ভোগে শ্রীমতী লজ্জাভয় জলাঞ্জলি দিলেন, প্রাণেশ্বরকে লোকভয়ে অস্বীকার করিলেন না। তখন যে দিকে চান সেই দিকে মধু, বায়ু মেঘ সলিলে মধুকণা, সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণ। কৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া নিরন্তর প্রেমানন্দ সম্ভোগ করিতে

লাগিলেন। দুর্ব্বল নারী হৃদয় প্রেম সম্ভোগে পর্য্যুদস্ত হইল। বাঁশী বাজিলেই পথে পথে ছুটে, বাঁশী রব প্রাণে প্রাণে সুর মিলাইয়া দিল। তাই কখন কখন ব্যতিব্যস্ত হইয়া বলিতে হইত, আর যেন শ্যামের বাঁশী বাজে না বাজে না। তখনই যদি বাঁশী বাজে ত ছুটিয়া যায়। যদি না বাজে ত কাঁদিতে বসে। হরিণী এমনি করিয়া ব্যাধের বাঁশরী ভয় করে।

নিরন্তর সুখ সম্ভোগে সুখের উৎকর্ষতা হীনপ্রভ হয়। মাঝে মাঝে দুঃখ জুটিলে সুখের সৌখীনতা বৃদ্ধি করে। একটু ছোট ঢেউয়ের পরেই একটা বড় ঢেউ আসে। তাই প্রেমের বিরহ। বিরহ প্রেমের ব্যভিচারী নহে, সানুকূল। সে নবদূর্ব্বাদল শ্যামরূপ এখন আর প্রত্যক্ষ নহে। রূপের পরিবর্ত্তে হরি-নাম রাধার হৃদয় সিংহাসন অধিকার করিল। ভাবের অভাব পূর্ণ করিতে পূর্ব্বস্মৃতি প্রাচীন কাহিনী উত্থাপন করিতে লাগিল। কিছুতেই রাধার প্রাণ ভরে না। যমুনা পুলিনে সেই বংশী বটচ্ছায়ায় প্রাচীন কেলীসদনে শ্রীমতী রাধানাথের বংশীরব অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মুরলীর মধুরতা এত দিনে সম্যক অনুভূত হইল, তাই কাঁদিতে লাগিলেন। বাঁশী বাজ রে বাজ রে। রাখালশশী গুণমণি শ্যাম বিরহে শ্যাম সোহাগিনী রাধিকার সযতন সঞ্চিত কমল মালা শুকাইয়া যাইল। একদিন হরিকে পাইয়া সম্যক আলিঙ্গনে বাধা দিবার ভয়ে যে নীলকণ্ঠ হার উন্মোচন করিয়াছিলেন, সে নীলকণ্ঠ হার তুলিয়া অঙ্গে পরিলেন; কিন্তু ফুল ভেল শূলসম হার ভেল ভার, সকলি বিপরীত হইয়া উঠিল। চন্দ্রকরে সূর্য্য-কিরণ, চন্দনে গরল, সিন্দূরে অগ্নি শ্রীমতির দেহ দাহ করিতে লাগিল। এমন সময়ে যদি একবার রাধা রাধা বলিয়া বাঁশী

বাজিত! যার জন্য অভাগিনী সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসিনী হইয়াছিল, সে যদি একবার ফিরিয়া চাহিত, না হয় দূর বন হইতে একবার বাঁশী বাজাইত। কেন বাঁশী বাজিল না। শ্যামের সঙ্গে শ্যামের বাঁশী অদৃশ্য হইয়াছে, এখন রাধিকার দিব্যোন্মাদ উপস্থিত হইল। কখন মেঘে শ্যাম রূপ দেখিয়া শ্যামচন্দ্রের ভ্রম হয়, ছুটিয়া সেই দিকে যান, কখন ক্ষণিক জ্ঞানে শ্যাম বর্ণ সহচরী বৃন্দকে তাড়াইয়া দেন, যেন তাহারা শ্যামরূপ স্মরণ করাইয়া না দেয়। কখন পিকরবে মুরলী ভ্রম হইয়া আহ্লাদে নৃত্য করেন; কখন সংজ্ঞা হইলে সখীগণকে তিরস্কার করেন।

কেন এত ফুল তুলিলি সজনি,
যতন করিয়া ভরিয়া ডালা॥
মেঘাবৃত হোলে পরে কি রজনী,
কহল সজনি তারার মালা॥

কখন স্বপ্নে কৃষ্ণ দর্শন করেন, সখীগণকে শ্যামসঙ্গ কাহিনী বিবৃত করেন, কখন জাগ্রত হইয়া কাঁদিতে থাকেন, সখীগণকে অলঙ্কার উন্মোচন করিয়া দেন। শুক সারিকাকে, যার হৃদয়ে প্রেম উছলায় পশু পক্ষীও তার প্রেমের ভাগ পায়, সেই প্রেমের দিনের সুখের দিনের শুক সারিকাকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করেন। কখন শ্যাম শ্যাম বলিয়া মাধবীলতা গলায় বাঁধিয়া আত্মহত্যা করিতে যান, কখন যমুনার শ্যাম জলে শ্যাম ভ্রমে আত্মবিসর্জ্জন করেন।

এক মুরলীরব বিহনে শ্যাম সোহাগিনীর এ দুর্দ্দশা!

এ মুরলীর মধুরত্ব পাশ্চাত্য কবি বুঝিবে কি? রাধিকার উলঙ্গ প্রেমের গভীরতা কয় জন বুঝে? পাশ্চাত্য দর্শনে

মুরলীর সংজ্ঞা Inspiration এবং রাধিকার নাম soul।

যেমন গাটা গোটা শরীর তেমন কটকটে ভাষা। গোখাদকের ভাষায় কি সরসতা আছে? গোখাদকে মুরলীর মধুরতা বুঝিতে পারিবে কেন?

আমাদের সে মুরলী নাই, সে শ্যাম নাই, সে রাধিকা নাই। বৃন্দাবনে আজ হাহাকার, তরুলতা মৃগ পক্ষী সকলেই কাঁদিতেছে। যদি আমার রাধিকা থাকিত, তবে মুরলীও বাজিত, শ্যামচন্দ্রও আসিতেন। রাধিকা শ্যাম ও মুরলী হারাইয়া পাগলিনী হইয়াছিলেন, আমি আমার রাধিকাও হারাইয়াছি। এখন কাকে ডাকি বল দেখি? আমার কিসের অভাব বল দেখি? আমি কি কহিব বল দেখি?

---

# পাষাণী।

আমি কতদূর হইতে আসিলাম। দূরে গভীর গিরি গহ্বরে আমার জন্ম। বনভূম-আঁধারে আবরিত, ক্ষণদৃষ্ট ক্ষণবিধ্বংসী জলদজালে পরিবেষ্টিত, দ্বিপীভল্লুক-নিনাদিত অন্ধকার বনভূমের মধ্য দিয়া তোমারি জন্য ছুটিয়া আসিলাম। অন্ধকারে ভীষণ জীবজন্তুর দুরধিগম্য, কীট পতঙ্গ নিবারিত প্রবেশ, ভুবনভাস্বরভাস্করের হিরণ কিরণে নিরালোকিত গিরিগুহার ভিতর আছে স্থান অতি ভয়ঙ্কর, না চলে ভানুর ভাতি, তমোময় দিবারাতি, সেই স্থান দিয়া অতিধীরে, কেহ না জানিতে পারে, না চিনিতে পারে, তাই ভয়ে ভয়ে অতিধীরে চুপে চুপে আসিয়াছি। পথে রাক্ষসের ন্যায় ভীষণ রাশি রাশি বিশাল প্রস্তরে বাধা দিয়াছিল, কুল কুল করিয়া কাতর স্বরে তাহাদের নিকট কতই কাঁদিয়াছি, নিরাশ্রয় কুমারী দেখিয়া রাক্ষসেরা দুরভিসন্ধি পরিত্যাগ করে নাই। অনাথিনীর কাতরতায় কয়জনের দর-বিগলিত হৃদয় দেখিয়াছ? শেষে অনাথবন্ধুর শরণ লইয়া কোনও প্রকারে চলিয়া আসিয়াছি। হৃদয়ের গভীর গুহায় নিঃশব্দে পরিপোষিত ভাল বাসার কত বল, লক্ষ লক্ষ বৎসরের জন্য পরিচয় দিবার নিদর্শন রাখিয়া আসিয়াছি। ইহাও বলিব, কোথাও কুসুমকলিকায় ভ্রমরের গুঞ্জনে, শ্যামল লতিকায় পাদপের সস্নেহ আলিঙ্গনে, তরুশাখায় কলকণ্ঠ বিহঙ্গের প্রণয় চুম্বনে উৎসাহ পাইয়াছি। শোকে দুঃখে, বিপদে সম্পদে, রোগে স্বাস্থ্যে দূরে দূরে অতি দূর হইতে তোমারই মুখখানি স্মরণ করিয়া, বুকে অপরিমিত প্রণয় কুসুমের রাশি লইয়া, বালিকা নবপ্রণয়ের গাঢ় উচ্ছ্বাস লইয়া

তোমারি চরণতলে আসিয়াছি, পঁহুছিয়াছি। বঁধু হে, সখা হে, আমাকে চরণ তলেই ফেলিয়া রাখিলে! বুকে তুলিয়া লওনা?

আমি. বন মালতী, অটুট যৌবনভারে অবনত, শাখায় পাতায় প্রফুল্ল, বুকভরা মদগন্ধে দিগন্ত আমোদিত,—উড়ে উড়ে কতদূর হইতে মধুপগণ ছুটিয়া আসিতেছে, বাতাসে বেচারীদের উল্টে পাল্টে দিতেছে, কুয়াশা উঠে চক্ষু অন্ধ করে দেয়। পথভ্রম ঘটে, তবু আমার বুক পোরা গন্ধে সব ছুটে আসে, গুণ গুণ করে কাণের কাছে কতই প্রণয় সঙ্গীত গাহিয়া থাকে। কত কথাই বলে, দুর্ব্বল নববিকশিত কুমারী মল্লিকা জাতী যুথী তাদের মিষ্ট কথায় ভুলিয়া যায়, আমার তাদের ক্রন্দন কাতরতায় কাতরতা হয় না, ভালবাসার উচ্ছ্বাস দেখিয়া আনন্দ হয় না, আমি অটল অচল দৃঢ়তায় পাষাণের সমান কঠোর। এক আশায় এক উৎসাহে মনুষ্যের দুর্ব্বলতার পরিমাণ আমি বুঝিতে পারি না। আমি অহৃদয় নহি, যখন দুঃখ বুঝিতে পারি তখন চোখের জলে তাদের সন্তাপের শান্তি করি, কিন্তু আমি যা বুঝি না, তার জন্য কাতর হই না। লোকে আমাকে তজ্জন্য অহঙ্কারী বলে, গরবী বলে, কত কি বলে। তাদের নিন্দায় আমার দুঃখ হয়, আমি কাঁদি যে কেন তারা আমায় বুঝে না। যাই হউক আমার সকল তেজ, সকল বল তোমার কাছে উবিয়া যায়। আমি তখন ননীর পুতলির মত গলিয়া পড়ি। তোমাকে আলিঙ্গন করিয়াছি, ফুলের পরাগে তোমার মুখখানি ধূসরিত করিয়া দিতেছি, আতপতাপিত মস্তিষ্ক পল্লবে ঢাকিয়া রাখি, বায়ু তাড়িত দেহ আপন দেহ দিয়া আচ্ছাদন করি। ফোয়ারার মত আমার ভালবাসা একটী উর্দ্ধ রেখায় তোমারি পানে ছুটিয়াছে। বঁধু হে! সখা হে!

আমাকে বুকের বাহিরে রাখিয়াছ কেন? ভিতরে পুরিয়া লও, বুকের ভিতরে ভিতরে তোমার অন্তরের অন্তরে আমাকে লুকাইয়া রাখ, উন্মত্ত যুবকগণের বিড়ম্বনা হইতে আমাকে আশ্রয় দাও।

বিশাল বিশ্বব্যাপী মহাসাগরজলে ভরা, প্রাণে ভরা, মুক্তা রতনে ভরা। তবুও তার হৃদয়ের ভিতরে কি অব্যক্ত দুর্দম বাসনা। কিসের জন্য সে বুক ফুলাইয়া ফুলাইয়া উঠিয়া থাকে, ছুটিয়া গিয়া ধরণীর পায়ে লুটাইয়া পড়ে, মনের কথা ফুটিতে না পারিয়া গুমরে গুমরে কাঁদে আর লুটাইয়া পড়ে। প্রণয়ের সাক্ষী, অনন্তের আদর্শ, অতলস্পর্শ মহাসাগর, তাহার চঞ্চলতা তাহার অতলস্পর্শ বুক পূর্ণ করিয়া উছলাইয়া পড়ে, এমন তার কিসের বাসনা? সে আর কোনও দিকে যায় না কেন? তাহাকে লোভ করে জগতের কে না? রত্ন ত কাহাকে অন্বেষণ করে না, সবাইত রত্নকে অন্বেষণ করে। তবে সমুদ্র-প্রাণভরা যৌবন ভরা সমুদ্র কাহার জন্য পাগল? ধরণী, ফল পল্লব সুশোভিতা শ্যামাঙ্গিনী কোমলা কোথায়, কেমনে তাহার প্রাণ আকর্ষণ করিয়াছে। তাহার পর আর তাহার সঙ্গে কথাটীও কয় নাই, বুঝি তাহার কথাগুলি শুনিয়াও বুঝে না, তাহার প্রাণের গভীর আশা উপেক্ষা করিয়া তাহার প্রণয়োচ্ছাস তরঙ্গায়িত করিয়াছে, মর্ম্ম স্থল তাড়িত চালিত করিয়াছে, তাই সে—

আছাড়ি চূর্ণিতে চাহে সমগ্র হৃদয়
কঠিন পাষাণময় ধরণীর তীরে।

বাহুলতায় ধরণীর সমগ্র দেহ আবেষ্টন করিয়া সমুদ্রের পিপাসা মিটে নাই, চুম্বনে চুম্বনে তুফান তুলিয়াছে, তবুও ধরণী কথা কয় নাই, তাই তার পিপাসা বাড়িয়াছে। সে ধরণীর

সঙ্গে মিশাইয়া যাইতে চায়, দুই এক হইতে চায়, দুইখানি তনু এক করিতে চায়—

বিজন বিশ্বের মাঝে মিলন শ্মশানে
নির্ব্বাপিত সূর্য্যালোক লুপ্ত চরাচর
লাজ মুক্ত বাসমুক্ত দুটি নগ্ন প্রাণে
তোমাতে আমাতে হই অসীম সুন্দর।

•যে যত বড় তার তত উচ্চ আশা। নির্ঝরিণী পর্ব্বতের পদতল হইতে বুকের উপরে উঠিতে চায়, মালতী বুকের বাহিরে যাইতে চায় না, ভিতরে প্রবেশ করিতে চায়, মহা-সমুদ্রের আশা আরো মহান্ সে দুইয়ে মিলিয়া এক হইতে চায়। এইখানে প্রেমের পরাকাষ্ঠা।

পাষাণী,—হৃদয়ের এ মর্ম্ম ব্যথা কি ঘুচিবে না? কত কথা চরণে ধরিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিলাম, একটা কি তার শুনিলে না? অস্ফুট অনন্ত বাসনা ফুটিয়া আর কি হইবে, আর ফুটিব না। প্রাণের আশা নিশ্বাসের সহিত বুকের ভিতর চাপিয়া কাঁদিয়া ফিরিয়া চলিলাম।

এখন আমার একটী প্রার্থনা। বুকটা পাতিয়া দিই, পা দুখানি বুকের উপর চাপিয়া দিয়া বুকটা দলিয়া দাও। এ চিরদিনের হুহু হুহু বাতাসের শব্দ, অনন্ত ঝটিকা আর সহে না, প্রাণ তোলপাড় হইয়াছে আর সামলাইতে পারি না। একবার শ্যামারূপে বুকের উপর দাঁড়াইয়া, বুকের আশা ভরসার সহিত জ্বালা যন্ত্রণা সব ঘুচাইয়া দাও। অনন্তকাল মহাপুরুষ যখন এতই সহিতে পারিলাম, বুকের উপরে পাইয়া ভিতরে পুরিতে চাহিলাম, সে আশা মিটাইলে না, তাহাও সহিতে পারিলাম তবে কি আমি মহাপুরুষ নহি? মহাপুরুষ শান্ত সদাশিব

হইয়া, চরণ তলে পড়িয়া পড়িয়া স্তিমিত নয়নে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকি, তুমি কালী কঠোর নির্ম্মম হৃদয়ে বুকের উপর চিরদিন দাঁড়াইয়া থাক. যেন কানে কানে .কখন কোন বাসনা পুরুষের হৃদয়কে বিচলিত না করিতে পারে। একাকিনী অনন্ত কাল হৃদয়ে রাজত্ব কর—রাধা প্রেমের কোমল বন্ধনও যেন তোমাকে বদ্ধ করিতে না পারে। কালের, স্থানের, হৃদয়ের, স্বর্গের, মর্ত্ত্যের, পাতালের অধীশ্বরী হইয়া রাজত্ব কর, কেবল আমার চোখের উপর চোক দুটি রাখিও, আমি মুখ খানি দেখিতে দেখিতে যেন অনন্তে মিলাইতে পারি। পাষাণি পাষাণি-আর কিছু বলিব না।

না না ও মুখের দিকে আর চাহিব না। আকাশের পাখী তোমার মুখখানি দেখিয়া বাগুরায় বন্দী হইয়াছিলাম। তুমি কঠোর চরণে বুক দলিয়া দিলেও মুখখানি দেখিলে আবার বুক ফুলিয়া উঠিবে। ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, আমার বন্ধন ঘুচাইয়া দাও, আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, সর্ব্বনাশি, আমাকে গৃহবাসী কেন করিয়াছ? ছেড়ে দাও চলে যাই, মোহ ভাঙ্গাইয়া দাও, এ মায়া কাটাইয়া দাও। যদি তোমাতে মিশিতে না পাইলাম, অনন্তে মিশিতে চাহি না। ছেড়ে দাও, চোক বুজিয়া ধরণীর শান্তিময় ক্রোড়ে প্রবেশ করি। এ তুফান সহে .না। বড় জ্বলিয়াছি। চলিলাম, চলিলাম। পাষাণি। পাষাণি। তুমি একাকিনী সুখে থাক। মরণেও তোমার মঙ্গল কামনা করিব, চলিলাম,—

"জগতের মরুভূমে, দ্বিপ্রহরে রবিতাপে,
শুষ্ককণ্ঠে করিতে চীৎকার
সে পাষাণী কোথায় আমার?"

---

# প্রতিমা।

সকল দেশে সকল লোকে প্রতিমার পূজা করে। অজ্ঞান জুলু ও জ্ঞানী স্পেন্সার সকলেই প্রতিমার উপাসক। প্রতিমা পূজা স্বাভাবিক। কল্পনায় মনুষ্যত্ব; ভাবশূন্য জীব নাই। কাহারও ফুটে, কাহারও ফুটে না। কিন্তু এমন কেহ নাই, কি কোন গানের মত যাহার কাণের কাছে একেবারে বাজে না। ফুলের হারে কোনটী কলি, কোনটী ফুটন্ত ফুল।

ফুল লইয়া মানুষের চির দিনের কারবার। ফুল দিয়া শিশু পুতুল সাজায়, কুমারী ফুল দিয়া বনদেবী সাজে, যুবতী সপত্র বেলের কলি বুকের উপর গুঁজিয়া রাখে, প্রাচীনা ফুলের হারে ও গঙ্গাজলে দেবতার পূজা করে। হৃদি ফুলহার নিদ্রার আবেশ সঞ্চার করে। মানুষের প্রাণটী ফুলের রাশি, শিশুর হাসি তাহার নিদর্শন। তাই মানুষ ফুলের এত সোহাগ করে, দেবতার পায় ফুলের অঞ্জলি দিয়া কৃতার্থ হয়। ফুলের স্বপন কি মধুর! সে স্বপন যেন স্বপন না হয়। ধীরে ধীরে ফুলটী ছুঁইতে হয়। সে যেন ফুলের ঘাও সহিতে পারে না! শীতল বায়ু ধীরে ধীরে তার হাতটী ধরিয়া তার সঙ্গে খেলা করে। তার প্রাণটী বড় কোমল, অতি কোমল লতিকায় শিশিরের শীতল জলে নিশির শীতল ছায়ায় তাহার জন্ম। মধুলোভে চঞ্চল অলি চারিদিকে কত ছুটিয়া বেড়ায়, কুসুমের কাছে পৌছিলেই তার চঞ্চলতা দূর হয়, অতি ধীরে ধীরে সে ফুলের মুখ খানি চুম্বন করে, যেন তার ঘুমটী না ভাঙ্গে। সে এতই কোমল যে তার দিকে চাহিতে ভয় করে, পাছে আমার খর দৃষ্টির চাপে শুকাইয়া যায়, আর না ফুটে। "চাহিব না কুসুম

পানে, চাহিব নাক আর, চাইলে পরে শুকিয়ে যাবে, ফুটবে না সে আর।" সে যে হৃদয় মাত্র, হৃদয়ের প্রতিকৃতি ফুল। গঙ্গা পূজা করিতে গঙ্গাজল চাই। হৃদয়ের পূজা করিতে হইলে ফুল দিতে হয়, ফুল হৃদয়ের প্রতিনিধি, ফুল দিলে হৃদয় দেওয়া হয়, স্বধু ভালবাসা নয়, শুধু স্নেহ হয়, শুধু ভক্তি নয়, সমস্ত হৃদয়টা, হৃদয়ের সবটা দেওয়া হয়। ভক্তির চেয়েও পবিত্র, ভালবাসার চেয়েও কোমল, যুঁথী, জাতী, মালতী। ফুল ছাড়া পূজা, আর কাণুছাড়া কীর্ত্তন, দুই প্রলাপ। কথা শুষ্ক, নিশ্বাসে গরলিত, কথা দিয়া পূজা একটা উদ্ভট রহস্য। হৃদয়ের মধ্যে আশা যখন ঘোমটা দিয়া থাকে, বড় কোমল, বড় পবিত্র। গলার শ্লেষ্মা, নিশ্বাসের ধূলি, দাঁতের কঠোরতার মধ্য দিয়া কথা রূপে যখন বাহির হয়, তখন তাহার সতীত্ব ঘুচে, সে তখন বারবনিতা। বারবনিতা উপহার দিয়া দেবতার পূজা?

হৃদি ফুলহার দেবতার গলায় দিব। বর মাল্য দিয়া তাঁহাকে বর সাজাইতে বড় সাধ হয়। দেবতা আমার মত। কল্পনা তাঁহাকে আমার মত করিয়াছে। জ্ঞান তাঁহাকে আমার হইতে দেয় না। জ্ঞান শুষ্ক, কল্পনা কোমল, কল্পনার কোয়াষায় আমি কত ছবি দেখি, সূর্য্যের কিরণে কত বিচিত্র বর্ণ প্রতিভাত হয়, কত শিশু ক্রীড়া করে "সে নিতুই নব" কত তরঙ্গ ছুটে, আনন্দ ফুটে, বিষাদ টুটে। উচ্ছ্বাসের ফেণ রাশি দিশি দিশি ধাওয়ে। গেটে ও সেক্সপিয়ার, যবও ইসায়া, দান্তে বা পেটরার্ক, রাস্কেন বা ফিডিয়াস, সাধ্য কি সে অপূর্ব্ব চিত্র তুলিকায় চিত্রিত করিবে? সে অর্দ্ধ ফুটন্ত মালা, তার অর্দ্ধেকটা জানা গিয়াছে মুহূর্ত্ত ফটোগ্রাফে সে চিত্র উঠে না। সে যে চুরি করে চায়, চোখের চাহনিটিও ধরিতে পারি না।

চোকে চোকে দেখা হইলে সে ছুটিয়া পালায়। ফটোগ্রাফে উঠিবে কি? পটুয়া ধরিবে কি? সে আধফুট হাসি কল্পনার নিজস্বধন।

সে কোয়াসার কোমল কান্তি, ঊর্ণনাভের লূতাতন্তু, জ্ঞান কঠোর অঙ্গুলি ঘাতে চূর্ণ করিয়া দেয়। শীতল ছায়া বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের দীপ্ত কিরণে মস্তক দগ্ধ করে। সে দীপ্ত শিরার অভিষেক আর হয় না। আমার কোমলতা লুটাইয়া পড়ে, প্রবৃত্তির মোহ চলিয়া যায়, স্বপনের আবেশ ভাঙ্গিয়া যায়, একটা সহরের গোলমাল মাথায় ঢুকে, সাহারার আগুনে বাতাসে প্রাণের প্রাণ যায়। মনুষ্যের মনুষ্যত্ব ঘুচিয়া যায়। মানুষ মরিয়া দেবতা হয়। দেবতা মরিয়া ভূত হয়। নিরাকার!!! আকাশের মতও নহে, আকাশের প্রতিকৃতি সাগরের মতও নহে। বজ্রের মতও নহে, মৃত্যুর মতও নহে। নিরাকার!!! কেন আমাকে জ্ঞান দিয়া ছিলে? সয়তান হইয়া আমাকে জ্ঞানের ফল কেন খাওয়াইয়াছিলে? অনন্ত পিয়াস মিটেনা, বুক ফাটিয়া যায়। অনন্ত তুষানল নিবে না। পলে পলে অণুর পর অণু ঝলসিতেছে। অনন্ত কালই অনন্ত নরক যন্ত্রণা ভুগিতে হইবে। নাস্তিকতা বা আত্মহত্যা জ্ঞানের পরিণাম। কেন আমাকে জ্ঞান দিয়াছিলে? চিরদিন কেন শিশুর মতন রহিলাম না? আর ত তেমন করিয়া তোমার কোলে বসিতে পারি না, মুখখানি ধরিয়া চুম দিতে পারি না, চুলগুলি লইয়া খেলিতে পারি না। মা বলিয়া ডাকিতে পারি না। রাঙ্গা চরণ দুখানি ধরিয়া বুকে তুলিতে পারি না। মান অভিমান, হাসি তামাসা, ক্রীড়া কৌতুক, সব ফুরাইল। আর তুমি আমার হইবে না। জ্ঞান-জ্ঞান-জ্ঞান, মৃত সমুদ্রের

পাঁশ ফল, যে জ্ঞান চায়, সে লউক, আমিত চাহিনা। নির্ম্মম নির্হ্দয়, কালা বোবা কাণা, তুমি নাস্তিকের স্কন্ধে চাপিয়া বস। আমি কল্পনাকে লইয়া দুদিন খেলিয়া লই। তোমাকে ফুলের মালায় প্রতিমা সাজাইয়া মনুষ্যত্ব সার্থক করি। শিশুর সরলতা, অজ্ঞানতা, কল্পনাপ্রবণতা, ক্রীড়াপ্রিয়তা যেন জন্ম জন্ম আমার থাকে। এস একবার সোহাগ করি। আমি মনুষ্য, মনুষ্যত্বই আমার আদর্শ। দার্শনিকের কাছে তোমার দেবত্ব খাটাইও, আমার কাছে গৌর হয়ে এস, আমি তোমাকে বালভোগ খাওয়াইব, শোয়াইব, বসাইব। আদর করিব, অপমান করিব, কখন বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিব, আবার কখন হৃদি সিংহাসনে বসাইব। তুমি আমার গরু চরাইবে, বাধা বহিবে, কখন গোবর্দ্ধন ধরিবে, কখন বাঁশী বাজাইবে। ধানের কনক শিরে দুলিবে, কমল বনে বীণায় ঝঙ্কার দিবে, কখন করে অসি গলে মুণ্ডমালা দিয়া আমার শত্রু শাসন করিবে। আমাকে পৌত্তলিক বলিয়া পণ্ডিতে উপহাস করুক সে ভাল, আমি নাস্তিক বলিয়া দার্শনিকের গৌরব আকাঙ্ক্ষা করিব না।

তোমার না কি হৃদয় নাই? আমার চোখের জল গুলি বালিতে শুকাইয়া যায়। আমার মর্ম্মভেদী করুণ বিলাপ বাতাসে উড়িয়া যায়। তোমার কাণ নাই শুনিবে কি? চোখ নাই দেখিবে কি? আমার প্রাণের অনন্ত পিপাসা, হৃদয়ের অতৃপ্ত বাসনা চিরদিন অতৃপ্ত রহিবে, বনফুল শুকাইয়া বনভূমে ঝরিয়া পড়িবে, কোমল লতিকা নিদাঘ তাপে মাটিতে মাথা লুটাইবে। কারণ তোমার হৃদয় নাই, আকাঙ্ক্ষা নাই, হৃদয়বানের সহিত সহানুভূতি নাই। আমি পরকালেও অবিশ্বাস

করিতে পারি, কিন্তু মনুষ্যত্ব ঘুচাইতে পারি না। বরং আত্ম-হত্যা করিয়া এক দিনে সকল যাতনা ঘুচাইতে পারি, কিন্তু সন্ন্যাসী হইয়া অনন্ত দিনের অনন্ত যাতনা সহিতে পারি না। হৃদয়ের বাসনা শুকাইতে হইবে, যে ছেলেগুলি যত্ন করিয়া বুকে পুষিয়া দীর্ঘকাল মানুষ করিয়াছি, চোখে দেখিয়া হাতে ধরিয়া তাহাদিগকে গলা টিপিয়া মারিতে হইবে, আর তাহারা আমার মুখের পানে চাহিয়া থাকিবে। একটা নিশ্বাসও ফেলিতে পারিব না। তাহা হইলে নিবৃত্তি হইল কৈ?!!! এক ফোঁটা চোখের জল ফেলিতে পারিব না। তাহা হইলে নিষ্কাম হইলাম কৈ!!! কাজ নাই ভাই তোমার নিষ্কাম ধর্ম্মে, তোমার নিবৃত্তি মার্গে, আমার গৃহস্থের সংসার ভাল। তোমার সন্ন্যাস, তোমার যোগ, তোমার সংযমন, তোমার থাক, আমি মনুষ্যত্ব চাহিব। প্রবৃত্তির তরঙ্গের উপর হাত পা ছাড়িয়া দিয়া বুক পাতিয়া সাঁতার দিব, কখন পর্ব্বতের চূড়ায় চড়িব, কখন অতল জলে ডুবিব। পর্ব্বতের আঘাতে কখন বুক চূর্ণ হয় সেও ভাল, আমি নির্ব্বাত নিষ্কাম শুষ্ক নিরাপদতা চাহি না। শ্বাপদসঙ্কুল বনভূম শুষ্ক বালুময় নির্জীব মরুভূমি অপেক্ষা প্রিয়তর। আমি কাপুরুষ নহি, সংযমন সন্ন্যাসকে ভয় করি না, আবশ্যক হইলে অকাতরে তোমার পায়ের উপর প্রাণটা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিতে পারি, কিন্তু জ্ঞানের চাকচিক্যে প্রতারিত হইয়া সজ্ঞানে আত্মহত্যা কেন করিব? সাধ করিয়া পাগল হইব? যে মনুষ্যত্ব পরিত্যাগ করে, সে আত্মঘাতী। যে দেবত্বের প্রয়াস করে, নরকে তাহার চির বাস ঘটে। আপনার প্রকৃতি ও আপনার ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন করিও না, গীতার এই মহান্ উপদেশ।

আমি জানিনা তুমি দেবতা কিনা। আমি বিশ্বাস করিতে পারি না, তুমি হৃদয় শূন্য। যদি তাহাই হও, সন্ন্যাসী বাতুল ও উন্মাদের নিকট হইও। আমার নিকট চিরদিন হৃদয়বান মানব প্রকৃতি হইয়া থাকিও। যদি না হও, আমি তোমাকে ছাড়িয়া মানুষের পায়ে আত্মসমর্পণ করিয়া মনুষ্যত্ব সার্থক করিব, উৎকট পিপাসার শান্তি করিব। আমার নূতন জন্ম, মনুষ্যত্বের পূর্ণতা পাইতে মনুষ্যই আমার উপযুক্ত আদর্শ। যদি আদর্শ মানবরূপে আমার চোখের সামনে দেখাদেওত তুমি আমার মনুষ্য জন্ম সার্থক করিবে। আমার ইষ্টগুরু হইবে। আর যদি নিরাকার, নির্ব্বিকার নির্ম্মম হইয়া সপ্তম স্বর্গে বসিয়া থাক, তোমার প্রতিমূর্ত্তি গড়িয়া তোমার ফটোগ্রাফ লইয়া তাহার সঙ্গে আনন্দ উপভোগ করিব। মনুষ্যত্ব ঘুচিবে যখন তখন তুমি কাছে আসিও। কেবল একটা অনুরোধ, প্রতিকৃতি যে তোমার অনুরূপ নহে, এইটা বুঝিতে দিওনা।

দেবতা লইয়া আমি কি করিব? আমার মত যাহার আকার নহে, সে কদাকার, আমার মত যে সুন্দর নহে সে কুরূপ, আমার মত যে কোমল নহে, সে পাষাণ, আমার মত যার হৃদয় নাই, সে রাক্ষস, তাহার সঙ্গে আমার সহানুভূতি নাই। সে আমার সখা হইবে কিরূপে? তাহার পায় বিকাইব কেন? হৃদয় তাহাকে চাহে না। যে আমাকে তাহার করিতে চায়, সে আমাকে আমি যাহা চাই, তাই দিয়া ভুলাইবে। আমি মানুষ, আদর্শ মানুষ চাই। দেবতা চাহি না, অব[illegible] চাই। আর আমি যাহাকে চাই, তাহাকে না পাইলে অন[illegible]—হোক না সে রূপবতী, হোক না সে গুণবতী তাহাকে—

কেন ভাল বাসিব? তোমার সপ্তম রাজ্যের অতুল ধন তোমার থাক, আমি তাহা চাহি না, তোমার স্বর্গের নন্দনকানন তোমার থাক, আমি তাহা চাহি না। আমাকে এই শ্যামাঙ্গিনী তরুলতা কুঞ্জ কানন শোভিনী পৃথিবী ভাল লাগে, এমন ঘাস পাতা, এমন ফুল ফল, এমন পশু পাখী, এমন নীলাকাশ, এমন চন্দ্রাতপ, আর এমন প্রিয়জন কি তোমার স্বর্গে আছে? আমার তৃষ্ণায় জল দেয়, ব্যথায় হাত বুলায়, কাছে বসাইয়া সোহাগ করে, এমন অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য, এমন অমৃত রাশি, এমন মনুষ্য কি তোমার স্বর্গে আছে? আমি মানুষ, আমি মানুষে মুগ্ধ, ভূত প্রেত দেব দানব, চাহি না, হইতে পারে তারা রূপবান্ কিন্তু রূপ ত আমার চোখে? আমার চোখ লইয়া দেখ দেখি এরা সুন্দর কি তারা সুন্দর, আমার হৃদয়টা লইয়া দেখ দেখি কিসে সে তৃপ্ত হয়!

মানুষের কাছে বসিলে আমার নেশা হয়। হেমন্তের শিশিরকণার মত মদিরা কণা আমার অজ্ঞাত সারে প্রাণটা ছাইয়া ফেলে। নেশায় বিভোর হই, যত পাই তত খাই যত খাই তত চাই। পিপাসা মেটে না-কেবল বলি, ঢাল ঢাল আরো ঢাল আরো আরো। এমনি যখন মাতাল হই, তখন আমাকে লইয়া তাহারা যাহা ইচ্ছা করিতে পারে। এ বড় সহজ উপায়। তাহার মত চোখ দুটী লইয়া, তেমনি মুখ খানি লইয়া আমার কাছে আসিও, তাহার পর আমি মাতাল হইলে, তোমার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণটা পূর্ণ হইলে যথাইচ্ছা পঞ্চম বা সপ্তম, যে স্বর্গে ইচ্ছা লইয়া যাইও। প্রথমে সহানুভূতি দেখাইও, আমার দুর্ব্বলতার একটু প্রশ্রয় দিও, তাহার পর ক্রমে ক্রমে শাসন করিও। ক্রম বিকাশ না হইলে পূর্ণ বিকাশ

হইবে না, ফুড়ুক করিয়া তুঙ্গ শৃঙ্গে উড়িয়া বসিলে চলিবে কেন? আমাকে অনেক ঘুরিয়া যাইতে হইবে। মাথা বেড়িয়া নাক দেখাইতে হইবে। ধীরে ধীরে হাতটী নাড়িয়া ঘুমটী ভাঙ্গাও। আমি তোমার দ্বারা শাসিত হইতে চাই, তোমার অবাধ্য হইব না। শাসনের কঠোরতা প্রথমতঃ একটু কোমল কর, আমি যে মনুষ্য, দেবত্বের পূর্ণ কঠোরতা আমাকে ত্রাসিত করে। হাতে ধরিয়া আস্তে আস্তে সঙ্গে লইয়া চল, আমার দুর্ব্বলতাকে উপহাস করিও না, তাহা হইলে চলিবে কেন? অযুত তরঙ্গে টলিবে না, এমন হিমাচল হইলে চলিবে কেন? পাষাণের সঙ্গে কি ভাব হয়? যখন ধন চাহিব ধন দিবে, যখন যশ চাহিব যশ দিবে। বালককে পুতুল দিয়াই ভুলাতে হয়। পাথর কুচি তাহার রুচিবে কেন? যখন বড় হইব, তখন আপনিত পুতুল ছাড়িব, আর চাহিব না। শিশুকে পুথী দিয়া কি ভুলান যায়? যখন বড় হইব তখন আশা উচ্চতর হইবে, তাই বলি যত দিন মানুষ থাকিব, মনুষ্যত্ব ভাল বাসিব, মানুষের প্রবৃত্তি মানুষের হৃদয় দেখাইয়া আমাকে শাসন কর। যখন দেবতা হইব তখন তোমার নিষ্কাম দেবত্বের প্রয়াসী হইতে পারি। ধর্ম্মের সার্থকতা জীবনে, যে ধর্ম্মে জীবন যায়, সে ধর্ম্ম লইয়া কি হইবে? তোমার নিষ্কাম ধর্ম্ম সাধন করিতে আমার মনুষ্যত্বের অবসান হইবে। তখন আমি আর আমি থাকিব না। আমি যদি আমি না রহিলাম, আমার যদি মৃত্যু ঘটিল, তবে নিষ্কামতা কাহার লাভ হইবে? পরের জন্য আমার প্রাণটা দিব কেন? এমন কবিতা পূর্ণ জীবন, এ কি ছাড়া যায়? এখন আমার হার ছড়াটী গলার পর, হাসিয়া একবার সোহাগ কর। নিরাকারতা নির্ব্বিকারতা, নিষ্কামতা, ঘটপটতা গিরিগুহায় ফেলিয়া

দাও। মানুষে যেমন খুঁজিয়া না পায়। সম্বর সম্বর, জ্ঞানের জ্যোতিটা একটু কমাইয়া বাঁধ, ঘরে একটু আলো-আঁধার হউক নতুবা ধাঁধাঁ লাগিবে। মনুষ্যত্বের কাঁচা মাটীর উপর দেবত্বের প্রাসাদ টেকিবে না। কি একটা কিম্ভূত কিমাকার হইবে। বালক পুতুল চাহে, মানুষ প্রতিমা চাহে। জোর করিয়া আমার প্রতিমা চূর্ণ করিয়া আমাকে হৃদয়হীন করিও না। হৃদয় আমার সর্ব্বস্ব। আর কিছু না থাকিলে আমার এই হৃদয়টী তোমাকে দিতে পারিব, এই হৃদয়ের উপর তোমার পদাঙ্ক আছে। ইহা পবিত্র স্থান, দেবমন্দির। চণ্ডাল না হইলে কি মন্দির ভাঙ্গিতে আর কেহ সাহস করে? সব ছাড়িতে পারি, হৃদয় ছাড়িতে পারি না, কারণ উহাই আমার মনুষ্যত্বের উপাদান। হৃদয় বড় না জ্ঞান বড়? হৃদয় বড়। সিংহ শৃগালের আদর্শ নহে, ব্যাঘ্র হরিণের আদর্শ নহে, দেবতা মনুষ্যের আদর্শ নহে, মানুষের আদর্শ মানুষ। আদর্শ যত উচ্চ হইবে, উন্নতি তত অধিক হইবে. সেই জন্য আমার আদর্শ দেবনর বা নরদেব। দেবতা মানব রূপ ধারণ না করিলে, মানবীয় ব্যবহার মানবের ন্যায় শোক দুঃখ জন্ম জরা জীবন মৃত্যুর অধীন না হইলে, মানব সমাজের স্থায়িত্ব ও ও উন্নতির মূল উচ্ছিন্ন হইত। প্রতিমা পূজা করিয়াই লোকে দেবতাকে পাইয়াছে। প্রতিমা না থাকিলে ঈশ্বর থাকিত না। এবং এমন দিন হইবে না যখন প্রতিমাকে অতিক্রম করিয়া প্রত্যক্ষ ভাবে ভাবশূন্য জীবনশূন্য দেবতা মানবসমাজে রাজত্ব করিবে। যেখানে ভাব নাই, সেখানে জীবন নাই, জলশূন্য নদী, উচ্ছ্বাস শূন্য জল, আকাশ কুসুমের ন্যায় অলীক। যে দেবতাকে হৃদয় শূন্য করিতে চাহে, সে দেব-

তাকে মারিতে চাহে। আমার দেবতা জীবন্ত, মানব প্রকৃতি-সম্পন্ন। আমার সঙ্গে কাঁদেন আমার সঙ্গে হাঁসেন্। তিনি জীবন্ত প্রতিমা, তাঁহাকে বুকে বুকে রাখি, চরণে ধরিয়া কাঁদি। আমার দেবতা প্রতিমা, আমার পূজা কবিতা। ফুলের দেবতা, ফুল দিয়া পূজা, ফুলের সৌরভে জগৎ পরিপূর্ণ। কল্পনায় আবাহন, কল্পনায় বিসর্জ্জন। প্রতিমা পূজা মধুর কবিতা। পুরোহিত সকলেই সুদক্ষ,—হোমর, যব, ইস্কাই-লাস, ইসায়া, দান্তে, রাবিলে, কালিদাস ও সেক্সপিয়র: প্রতিমা দর্শন, ফুলের ঘ্রাণ ও কাব্য পাঠ জগতের উৎকৃষ্ট পূজা। কবিতা ফুল ও প্রতিমা—অপূর্ব্ব সম্মিলন "তথা গয়া গঙ্গা বারাণসী, সকল তীর্থ মিলে আসি প্রভাস প্রয়াগ পদতলে।"

---

# তুমি কি আমার ?

গোধূলির ছায়ার সঙ্গে উদাসের ছায়ায় মনটা যখন ছাইয়া ফেলে, চিন্তার বায়ু থাকিয়া থাকিয়া বুকের উপর দিয়া যখন বহিয়া যায়, কে আমার—কে আমার নয় যখন গণিতে আরম্ভ করি, সংস্কারের মরুভূমে কএকটী তাল বৃক্ষ মাত্র যখন মাথা গুলি উচ্চ করিয়া দাঁড়ায়, যাহা কিছু মোহময়, যাহা কিছু রঙ্গিন, যাহা কিছু চপল চঞ্চল সাঁজের আকাশের কুয়াশার মত মেঘের সঙ্গে সঙ্গে যখন দূরে দূরে চলিয়া যায়, দূর যখন নিকট হয়, নিকট যখন দূরে যায়, অতীত বর্ত্তমান অন্তর্দ্ধান করে, তখন প্রাণের প্রাণ কাঁপিয়া উঠিয়া একটী কথা জিজ্ঞাসা করে,—"তুমি কি আমার" ? আমার আর কেহই নাই, আঁধারে সকলি ছাইয়াছে, যাহা কিছু উজ্জ্বল নিবিয়া গিয়াছে, যাহা কিছুতে ভুলিয়াছিলাম উড়িয়া গিয়াছে, পথ হারার একটী তারা, আঁধারের একটী আলো, প্রাণের একটী ভরসা, বুক পুরাইবার একটী জিনিস, সন্তান হীনের একটী সন্তান, বিধবার একটী শিশু, জগতের একটী প্রাণ, সমুদ্রের একটী নঙ্গর, পৃথিবীর যাহা কিছু,—তখন তুমি প্রভু, তুমিই দাস, তুমিই পিতা, তুমিই পুত্র, তুমিই মাতা, তুমিই কন্যা, তুমিই স্বামী, তুমিই স্ত্রী, তখন তুমিই আমার সর্ব্বস্ব, প্রাণের প্রাণ, প্রিয়তমা প্রেয়সী ; তোমাকে বুকের ভিতর পূরিয়া জিজ্ঞাসা করি, তুমি কি আমার" ? জানি তুমি আমার, তবু যখন সকলে উপেক্ষা করে, আপনার বলিয়া আর ফিরিয়া চায় না, শ্মশানে একাকী ফেলিয়া সকলেই যখন চলিয়া যায়, তখন ভয়ে ভয়ে তোমার মুখের দিকে চাহিয়া থাকি, সে মধুর কোমল শান্তিময়

মুখের দিকে এক দৃষ্টে চাহিয়া থাকি, প্রাণের ভিতর হইতে প্রাণ জিজ্ঞাসা করে, "তুমি কি আমার" ? "আমার চির দিনের" ? তখন একটা নিশ্বাস ফেলিতে ভয় হয়, পাছে বুক ভাঙ্গিয়া যায়। আমার অমূল্য নিধি, জীবন সর্ব্বস্ব অনিমিষে চাহিয়া থাকি, মুখে কথা ফুটে না, প্রাণে প্রাণে জিজ্ঞাসা করি, "তুমি কি আমার" ?

যখন কণ্টকে বুক চিরিয়া যায়, কশাঘাতে পৃষ্ঠ কাটিয়া যায়, মর্ম্ম পীড়ায় ধূলায় লুটাইতে থাকি, তখন হাসি মুখে কাছে এসে, একটী কথা কয়ে, গায়ে একবার হাত বুলাইয়ে সকল জ্বালা ভুলাইয়া দাও। তোমাকে এতই ভাল বাসি! তুমিও এত ভাল বাস। বিপদে আপদে না ডাকিতে, আপনি ডেকে নিয়ে কাছে বসায়ে আমাকে শান্তি দেও! তুমি ধনবান্ আমি দরিদ্র, তুমি সুবেশ আমি ছিন্নবাস, তুমি রাজরাণী, আমি ভিখারি, ভয়-করি পাছে ঘৃণা কর। মুখ ফুটে ডাকিতে সাহস হয় না। তোমার মন্দিরের ভিতরে প্রবেশ করা দূরে থাকুক মন্দিরের দেয়ালে মাথা কুটিতে ভয় হয়। কতদিন তোমার প্রাসাদের দিকে দূর হইতে চাহিয়াই চলিয়া, গিয়াছি, কিন্তু তুমিত ঘৃণা কর নাই, তোমার হাসি ত কমে নাই, তোমার আদর চিরদিন একই মত দেখিলাম। তুমি এতই ভাল বাস! যখন পায়ের ধূলা মাথায় তুলিতে বুক কাঁপিয়াছে—পাছে আমার স্পর্শনে শ্রীপদ কলঙ্কিত হয়, যখন পায়ের ধূলা দাও বলিয়া চাহিতে কাঁপিয়াছি পাছে আমার মুখনিঃস্থত বায়ুতে তোমার মন্দির গরলিত হয়, তখন তুমি আপনি ডাকিয়া কাছে বসাইয়া সোহাগ করিয়াছ। তুমি এতই ভাল বাস। সবই জানি, তবু অবিশ্বাসী প্রাণ শুনেনা। হাত ধরিয়া মুখের দিকে

চাহিয়া জিজ্ঞাসা করে "তুমি কি আমার"? কথাটী শুনিয়া তুমি গম্ভীর হইলে কেন? আমার অবিশ্বাসে আঘাত পাইলে? আশঙ্কা যে আমার বাড়িল। বলনা, কখনত ফুটিয়া বল নাই, যদি বলিয়া থাক ভুলিয়া গিয়াছি, যদি বুঝাইয়া থাক বুঝি নাই, আমি যে অবোধ। আমি মূর্খ, অথচ পণ্ডিতের মত অবিশ্বাসী। আমাকে আর একবার মুখ ফুটিয়া বল না? আর হয় ত জিজ্ঞাসা করিব না। কিন্তু তোমার মুখে ও কথাটা বার বার শুনিতে এতই ইচ্ছা হয় যে যদি চিরদিনই বল, তুমি চিরদিনেরই আমার, তবুও হয় ত আবার জিজ্ঞাসা করিব, "তুমি কি আমার"? সুধু শুনিতে মিষ্ট লাগে বলিয়াই কি? তুমি এত অমূল্য, পাছে তোমায় হারাই তাই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

অনেকে যে তোমার আরাধনা করে! সবাইকে যে তুমি হাসি মুখে আদর কর। আমাকে যেমন ভালবাসা দেখাও, সবাইকে ঠিক তেমনি দেখাও। সবাইকে কি দরিদ্র বলিয়া দয়া কর? আমি যে তোমার দয়া চাহি না, আমি তোমার ভালবাসা চাই। তা পাই কি? আমাকে যা দেও, সবাইকে কি তাই দেও। সবাইকে কি ভালবাসা দেও? ভালবাসাত একজন ছাড়া অনেককে দেওয়া যায় না! আমি যে সবার দলে যাইতে চাহি না। আমি তা চাই, যা আর কেহ কখনও পায় নাই, পাইবে না। আমি দশজনের একজন হইব না। তুমি সকলকে স্নেহ কর, দয়া কর, তাতে আমি বাধা দিব না। কিন্তু আমার ভালবাসায় সপত্নী কাহাকেও রাখিব না! তোমাকে এত ভাল বাসি, হয় একা তোমাকে পাইব, দিবা-নিশি বুকে বুকে তোমাকে রাখিব, না হয়, উঃ বুক ভাঙ্গিয়া

যায়! না হয় মরিব, তোমাকে না পাইলে মৃত্যুও ভাল। সে মৃত্যু যত কঠোর হয়, ততই ভাল। আত্মহত্যাই তখন পুণ্য বলিয়া বোধ হইবে। তাহা অপেক্ষাও ভয়ানক যাহা, তাহাও ইচ্ছা করিব। তবু সপত্নী রাখিব না। রাধিকা বালিকা প্রগল্‌ভা, প্রেম জানে নাই, কুব্জাকে কৃষ্ণ দিয়া কাঁদিবার জন্য বাঁচিয়াছিল। গোয়ালার মেয়ে, সে কি প্রেম বুঝে, কৃষ্ণ হে, আমি সখি সঙ্গেও তোমার সহিত সহবাস করিব না। আমার অতুল সুখ কাহাকেও দেখাইব না, দেখিতে দিব না। তুমি আর আমি—আর কেহ নাই। অতুল নীল আকাশের গভীরতায় তুমি আর আমি। বনে বনে সৈকত পুলিনে তুমি আর আমি। মন্দিরে সিংহাসনে তুমি আর আমি। জ্যোৎস্নার ভিতরে, গভীর অন্ধকারে, ফুলের কৌটাতে, লতার শিশিরে, ভ্রমরের গুঞ্জনে, মলয় পবনের উচ্ছ্বাসে, বিহঙ্গের সঙ্গীতে, সর্ব্বত্র সর্ব্ব সময়ে তুমি আর আমি। পৃথিবী নির্ম্মানব হউক, নির্জীব হউক, জগৎ শ্মশান হউক, চন্দ্র সূর্য্য তারা মুছিয়া যাউক, সপত্নী কেহ না থাকে, দেখিবার কেহ না থাকে, চক্ষুষ্মান্ কেহ না থাকে।—অনন্ত জগতে তুমি আর আমি, অনন্তকাল তুমি আর আমি। আচ্ছা দুজনে কেন এক হইনা, অঙ্গে অঙ্গে। যথা জলবিন্দু সিন্ধু জলে? না, তুমি মহৎ আমি ক্ষুদ্র? ছি ছি তা হলে কি ভালবাসা হয়? সমান সমান, তুমি যদি সিন্ধু হও, তবে আমিও সিন্ধু হইব, বিন্দু কেন? তাই বলিতেছিলাম দেহে দেহে প্রাণে প্রাণে হৃদয়ে হৃদয়ে, "হরি হর" নহে একটু চেনা থাকিবে না, কেহই দুই বলিয়া ধরিতে পারিবে না। তখন সবই তুমি, বা সবই আমি। তুমি আমি নাই। বিশাল বিশ্ব শূন্য—সূর্য্য নাই, চন্দ্র নাই,

আলো নাই, আঁধার নাই, কাল নাই, পল নাই—স্থানে অনন্ত সময়ে অনন্ত, প্রাণ একটী। সেটী পদার্থ নহে, গানের একটী রাগিণী মাত্র।

তুমি আমাকে নিষ্ঠুর বলিবে, রাক্ষস বলিবে। যে তোমাকে ভাল বাসিতে চায় তাহার মৃত্যু কামনা করিতেছি দেখিয়া আমাকে ঘৃণা করিবে। স্বার্থপরতায় ধিক্কার দিবে। বল দেখি তুমি কি? নিষ্ঠুর রাক্ষস নহ? কতদিন কান্দিয়া কান্দিয়া পথে পথে ফিরিয়াছি, তবু দেখা দেও নাই, বিদেশে কতকাল আমাকে ছাড়িয়া কাটাইয়া আসিলে, মনে আছে কি? পত্র লিখিলে উত্তর দেও নাই, মনে পড়ে কি? আবার বিদেশে পলাইবে বলিয়া কথায় কথায় ভয় দেখাও, এই কি তোমার ভাল বাসা? আমাকে কাংশ্য দিয়া অন্যদের সুবর্ণে রঞ্জিত কর, এই কি ঐকান্তিক প্রেম? একটা কুরূপকে আমার স্কন্ধে চাপাইয়া বলিয়া দিলে ইহার সঙ্গে সুখে দিন কাটাও, গণ্ডাকতক সন্তান বুকের উপর চাপিয়া বসিল, সংসারের শৃঙ্খলে কে আমাকে বাঁধাইল? মোদক বলিয়া কে আমাকে বিজ্ঞানের শিলা চিবাইতে দিল? আমি সন্ন্যাসী ছিলাম, কে আমাকে স্বাধীনতা বলিয়া দাসত্বে প্রবঞ্চিত করিতে চাহে, কে আমাকে স্বর্গের অতুল ঐশ্বর্য্য ছাড়িয়া নরকের পুরীষ ভক্ষণে মুগ্ধ করিতেছে? রাক্ষসি, আমার ভালবাসা তুমি তাচ্ছিল্য করিতেছ, আমি কি বুঝি না? ধনবান, বিদ্বান, গুণবানকে তুমি যে ভাল বাস আমাকে কি তেমনি ভাল বাস? তবে কাছে আসিতে বারণ কর কেন, ডাকিলেই দেখা দেওনা কেন, চাহিলেই পাই না কেন? প্রাসাদ বলিয়া আমাকে পাগলের গারদ দিতে চাহ, তুমি এমনি বন্ধু! সাধে কি

তোমাকে অবিশ্বাস করি? দয়া দিয়া, স্নেহ দিয়া আমাকে ভুলাইবে, আমি কি বালক? আমাকে ভালবাসা দিবে না আমি কি এমনই জঘন্য? তোমার জন্য সর্ব্বস্ব ছাড়িলাম, তোমার জন্য মায়ের বুকে আঘাত করিলাম, স্ত্রীকে কাঙ্গালিনী করিলাম, সাধের ছেলে মেয়েগুলিকে ভিখারী করিলাম, সমাজকে পদাঘাত করিয়া দণ্ড পাইলাম, তোমার জন্য সর্ব্বস্ব দিলাম। তবুও তোমাকে পাইলাম না। তোমার জন্য পাগল হইলাম, কত অসম্বন্ধ প্রলাপ বকিলাম,তবুও তোমাকে পাইলাম না। সকলের কৃপার পাত্র ঘৃণিত হইলাম, তবুও তোমাকে পাইলাম না। অহো অহো মৃত্যুই শেষে প্রার্থনীয় হইল।

না না। তুমি আমার ভালবাসা পরীক্ষা করিতেছ। প্রিয়তম, আমি দাসী হইয়া চিরদিন তোমার চরণ সেবা করিব। আমি তোমার ভালবাসার উপযুক্ত নহি। আমি দীন দুঃখী, কাতর উন্মাদ। আমার প্রলাপ ক্ষমা করিও। তোমার চরণের দাসী হইয়া রহিব, চিরদিন সেবা করিতে দিও। তাহা হইলেই সন্তুষ্ট হইব। "চরণ ছাড়া করিও না" তোমা বিনা আমার কেহ নাই। তোমার সেবা করিতে পাইলেই আমি সুখী হইব, আমি সামীপ্য সাযুজ্যরূপ মোক্ষ চাহি না, কেবল সেবা করিতে চাহি, দাসী হইয়া সেবা করিতে চাহি, আমার সেবা তাচ্ছিল্য করিও না। অনেককে লইয়া সোহাগ কর, যে তোমার ভালবাসার উপযুক্ত তাহাকে ভালবাসা দেও। আমি হিংসা করিব না। তুমি মহান্, আমি ক্ষুদ্র যখন চোখের জল পায়ে পড়িবে, একবার হাসি মুখে চাহিও। যদি পদস্পর্শে কলঙ্কিত হও, দূর হইতে স্মরণ করিতে দিও। স্মৃতিশূন্য যেন না হই। বিস্মৃতি মৃত্যু অপেক্ষাও ভয়ানক। দূর হইতে

স্মরণ করিব, অপূর্ব্ব রূপরাশি কল্পনায় উপভোগ করিব, দাসীর এবাসনাটী ঘৃণা করিও না।

একদিন তোমার ভালবাসা পাইব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। সে আশা ফুরাইয়াছে। দূর দর্শনে জ্ঞানী হয়, হতাশ হইলে প্রবীণ হয়। তোমাকে দেখিবার আগেই কলঙ্কিত হইয়াছিলাম, অমৃত আছে জানিবার পূর্ব্বেই গরল পান করিয়াছিলাম, আপনি কর্ম্মদোষে তোমার ভালবাসা হারাইয়াছি। মলিন আমি, পবিত্র তুমি, তোমাতে আমাতে এক হইবার সম্ভাবনা কোথায়? তখন তোমাকে স্পর্শ করিলে তুমি কলঙ্কিত হইতে, আমাকে কুলটা বলিয়া লোকে নিন্দা করিত। সমাজের চক্ষে আয়ান ঘোষই আমার স্বামী। আমিত সর্ব্বস্ব ছাড়িতে প্রস্তুত ছিলাম। জানিতাম কুল, মান, জাতি পরিত্যাগ না করিলে, কলঙ্কের ডালি মাথায় না বহিলে, বিবশ না হইলে, তোমাকে সর্ব্বস্ব না দিলে, তন্ময় না হইলে তোমাকে পাইব না। আমিত তাই সর্ব্বস্ব বিসর্জ্জন করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলাম, তবুও পিছাইলাম। আমার স্বার্থ হেতু তোমাকে কেন কলঙ্কিত করিব? কৃষ্ণ কালী রাধিকার কলঙ্ক। আমার কর্ম্মফল আমিই মাথা পাতিয়া ধরিয়াছি, তোমার ভালবাসা হারাইয়াছি। তুমিত সকলই বুঝ, আমার এ কথাটী কি বুঝ নাই? আমার কর্ত্তব্য আমি করিয়াছি, তোমার কর্ত্তব্য তুমি কর নাই।

তখন ভাবিয়াছিলাম, সখী হইয়া তোমার অনুসরণ করিব, আমি সুখী নাই বা হইলাম। আমার আবার সুখাসুখ কি? মনে মনে তোমাকে ত সর্ব্বস্ব করিয়াছি। তুমি সুখী হইলে আমার সুখ হইবে। তোমাকে সকলে সোহাগ করিবে, আদর

করিবে, যত্ন করিবে, ভাল বাসিবে, তুমি তাদের ভালবাসা দিবে দেখিয়া আমি সুখী হইব। পরীক্ষা বড় কঠিন, ঈর্ষার জ্বালা সহিতে পারিব কি না ভাবিয়া একবার আশঙ্কা হইয়াছিল। কিন্তু তোমা হইতে দূরে অন্ধকার। সে অন্ধকার অপেক্ষা ঈর্ষার জ্বালা লঘুতর। তাই সখীভাবে তোমার পরিচর্য্যা করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। কপালে তাহাও ঘটিল না। তোমার সংসর্গে যে থাকিবে তাহার যে মহত্ব থাকা উচিত। আমার তাহাও ছিলনা। আমি লক্ষ্মণের মত রাবণের ঘরে শক্তি সাধন করিতে যাইবার সময় শেলটী জটার ভিতর লুকাইয়া রাখিয়াছিলাম। আমার দুর্ব্বলতা আমাকে অপদস্থ করিল; তোমার পরিচারিকা হইতে হইলে গুণবতীও হইতে হয়। আমার সে গুণও ছিল না। অধোগতির লম্ব রেখা। একবার পড়িতে আরম্ভ করিলে আর দাঁড়াইতে পারা যায় না। কর্ম্মফলে সখ্যভাবেও বঞ্চিত হইয়াছি।

তথাপি দুরাকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি হয় নাই। তোমাকে ছাড়িয়া আর কাহারও কাছে যাইতে চাহি না। তোমার মত যে আর নাই; প্রতিকৃতি যে আর মিলে না,—তোমার মত বঁধু তুমিই গুণমণি। এখন তাই শেষ প্রার্থনা—তোমার দাসী হইয়া চরণ সেবা করিতে দাও। আমাকে তাড়াইয়া দিও না। তোমার দ্বারে পড়িয়া অনাহারে প্রাণ বিসর্জ্জন দিব, তবু তোমাকে ছাড়িয়া কোথাও যাইব না।

আশা করিয়াছিলাম, জিজ্ঞাসা করিব "তুমি কি আমার" তোমাকে আর উত্তর দিতে হইল না। আপন ভাগ্য দোষে চিরদিনের জন্য তোমাকে হারাইয়াছি। আমি কিন্তু পাপে পুণ্যে, সুখে দুঃখে, দূরে নিকটে চিরদিনই তোমার।

এক দিন ভাল বাসিয়াছিলে, সেই সুখ সেই সৌভাগ্য। এখন ভাল বাসনা, এখন তুমি আমার নহ। তাতে দুঃখ কি? আমার অপেক্ষা অধিক সুন্দরী পাইয়াছ, তুমি সুখী হইয়াছ, এই আমার সুখ। আমার আনন্দ হয় হিংসা হয় না। "তাবৎ অলি গুঞ্জরে,যাই ভুল ধুতুরারে যবেত ফুল মালতী নাহি ফুটে।" তুমি আমার নহ, এতে দুঃখ নাই তুমি ছিলে এই সুখ।

---

# অতৃপ্ত বাসনা।

বাসনা পূরে না। বাসনার প্রকৃতিই তাই। যে বলে, তাহার সাধ মিটিয়াছে, সে মুদির দোকান করে। মুদিরও সাধ মিটে না। শিশুর নাচিবার বাসনা, নাচিয়া নাচিয়া পা ধরিয়া গিয়াছে, নাচাইতে নাচাইতে হাত ধরিয়া গিয়াছে, তবু তাহার নাচিবার সাধ মিটে না। বালকের খেলিবার সাধ, সমস্ত দিন খেলিয়াছে, সন্ধ্যা হইয়াছে তবুত খেলিবার সাধ মিটে নাই। বালক অভিমানে রজনীকে অভিশাপ দেয়।

'যারে রজনি তুই মরিয়া
আমরা যতেক ভাই, হইলাম ঠাঁই ঠাঁই,
যারে রজনি তুই মরিয়া'

কাহারও সাধ পূরেনা। এ জনমের সাধ পূরেও না, ফুরায়ও না। অতৃপ্ত বাসনা কাতর কণ্ঠে চীৎকার করে,

"এ জনমের সঙ্গে কি সই জনমের সাধ ফুরাইবে
কিম্বা জন্ম জন্মান্তরে এ সাধ মোর পূরাইবে।"

কোন সাধ পূরেনা। ধনের সাধ, মানের সাধ, বিদ্যার সাধ, কোন সাধই মিটেনা। রূপের সাধ তাও মিটেনা, ঘসিলাম মাজিলাম কত কি করিলাম, তবু যেন তাহার মনের মতনটী হইলাম না। প্রেমের সাধ তাও মিটেনা। এক জনের অতীত দশ জনের কথা বলিতেছি না, সে যাহারা পারে—হয় তাহারা দেবতা, না হয় তাহারা পশু। সেই প্রেমময়ীর মুখ খানি—

"জনম অবধি হাম রূপ নেহারিনু নয়ন না তিরপিত ভেল
লাখ লাখ যুগ হিয়া হিয়া রাখনু তবু হিয়া জুড়ান না গেল।"

এ খেদের কথা নহে, আনন্দের কথা। বাসনা তৃপ্ত হইল না বলিয়া যে কাঁদে, সে বালক, প্রজাপতিটী ধরিতে পারে নাই বলিয়া দুকূল হারাইয়া অকূলে ভাসিতেছে। এ পিপাসার তৃপ্তি হইলে মানুষ কি বাঁচিত? জীবনের তৃপ্তি মৃত্যুতে, দিবার তৃপ্তি রাত্রিতে, বাসনার তৃপ্তি পাষাণে। যাহার বাসনা তৃপ্ত হইয়াছে, সে কৃপার পাত্র; হয় মরিয়াছে, না হয় পাষাণ হইয়াছে। বাসনায় তেজ, তেজে সজীবতা, সজীবতায় মনুষ্যত্ব। আমার বাসনা কখন যেন পূর্ণ না হয়। সত্যানন্দ বাঙ্গালীর কল্পিত ব্রহ্মচারী, সাধক নহেন। তাই বাসনা পূরাইতে চাহিয়াছিলেন। বাসনা পূর্ণ হইলে সে কি আর আমার থাকিবে? হিয়া যখন জুড়াইবে তখন আর তাহাকে হিয়ার ভিতরে পূরিতে বাসনা থাকিবে না, চক্ষু যখন তৃপ্ত হইবে তখন আর তাহার দিকে চাহিতে আমার সাধ হইবে কেন? তাহাকে কি ভুলিতে আমার সাধ? আমি জীবন চাহি, মৃত্যু চাহি না; যে মৃত্যু চায়, সে কৃপাধীন। আমি অনন্ত জীবন চাহি, অনন্ত কাল নির্নিমেষ নয়নে সেই একখানি মুখের দিকে চাহিয়া থাকিব। অতৃপ্ত বাসনার মধুরতা বুঝিয়াই বাসনাকে অতৃপ্ত রাখিবার জন্য কেহ কেহ বাসিতকে অনন্ত করিতে চান।

যাঁহারা ক্ষুদ্র প্রতিমা চাহেন না, অনন্ত নিরাকারের বাসনা করেন, তাঁহারাও ভণ্ডব্রহ্মচারী। প্রেমের মাহাত্ম্য বুঝেন নাই, নকলটাকে আসল বলিয়া ভ্রম করিয়াছেন। আমি নীলাকাশের একটী ক্ষুদ্র তারার দিকে চাহিয়া অনন্ত যুগ অতিবাহিত করিতে পারি, ফুলের বাগানে একটী যুই ফুলের সোহাগে এ জীবন গোঁয়াইতে পারি,ঘাসের বনে একটী শিশিরকণার অনন্ত সৌন্দর্য্য

অনন্তকাল দেখিলেও আমার তৃপ্তি হইবে না। আর সেই মুখ খানি, প্রতিমা-বিনিন্দিত সেই মুখ খানি, শরদের নির্ম্মল-গগনে পূর্ণ শশি বিনিন্দিত সেই মুখখানি, ননীর ছাঁচে আলতার পুটে রাঙ্গান সেই মুখ খানি, পলকে পলকে বহুধারূপিনী সেই মুখ খানি, আমার প্রাণ ভরা সেই মুখখানি—অনন্তের অনন্তত্ব ফুরাইবে, তবু তাহা দেখিবার সাধ আমার পুরিবে না। সে যে নিতুই নব, "লাখ নয়ন বিহি না দিল হামারে" বিধাতা যদি লক্ষ চক্ষু দিত, চক্ষে নিমেষ না দিত, আনন্দের অশ্রু না দিত, তার সেই গোলাপী সরম টুকু না দিত, সকলি জোছনার রাত্রি হইত, আর কোটি কল্প পরমায়ু হইত, তবুও তার সকল সৌন্দর্য্য দেখা হইত না।

ক্ষিতি রেণু গণি যদি আকাশের তারা
দুই হাতে সিঞ্চি যদি সিন্ধুক বারা।

সকলি যদি সম্ভব হয়, তথাপি আমার এ পিপাসা মিটিবার সম্ভাবনা নাই।—

কাজল দিয়া যখন চোখের ছানি কাটিবে, তখন তুমিও ভাই আমার মত দেখিবে। আমার মতনটী তুমি যখন পাইবে, তখন তুমি আমার মত বলিবে যে, প্রাণটা সদাই যেন "পাছে হারাই" করিয়া ভাবিতেছি। কেন ক্ষণেকের তরে কাল মেঘ আসিয়া সে পূর্ণ শশী আবরিত করে, বলিয়া বিধাতাকে নিন্দা করিবে, আমার মত তুমিও তাহাকে—

হৃদয়ক মৃগমদ গীমক হার
দেহক সরবস গেহক সার

বলিয়া সিদ্ধান্ত করিবে। তখন আর স্ত্রৈণ কলঙ্কে ভীত হইবে না। পাগলিনী রাধিকার মত স্পর্দ্ধা করিয়া বলিয়া

দিবে, যে ননদিনী গঞ্জনা ও তিরস্কার করে, সেই ননদিনীকে ডাকিয়া বলিয়া দিবে—

'ননদিনী বল নগরে
ডুবেছে রাই রাজনন্দিনী
কৃষ্ণ কলঙ্ক-সাগরে॥

না, বাসনার তৃপ্তি হয় না। বাসনার যে তৃপ্তি হয় না ইহাই মানুষের সৌভাগ্য। দুর্ব্বল ক্ষীণপ্রাণ জরাজীর্ণ পীড়িত-গাড়ী থামিলেই বাঁচে, স্রোতস্বিনীর উদ্দাম বেগ সে ধারণ করিতে সমর্থ নহে, বাসনার অতৃপ্তি সে ক্লেশকর মনে করে, অতৃপ্তবাসনাপূর্ণ উদ্দামজীবন অনন্ত তুষানল বলিয়া আখ্যাত করে, মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতে চায়। নীলকান্তারে পৃথিবীর গতি, নীল আকাশে গ্রহগণের দ্রুতধাবন কোনও দিন ক্ষান্ত হইবে না। অনন্ত আকাশে অনন্ত বিশ্ব অনন্তকাল চলিতে থাকিবে, আমার অনন্ত আত্মার অনন্ত বাসনা জন্মে জন্মে অতৃপ্ত রহিয়া যাইবে। ইহা অপেক্ষা সুখ সৌভাগ্য আর কি হইতে পারে? তুমি আর আমি, এক দিনের জন্য নহে, অনন্ত কালের জন্য নীল গগনে বিচরণ করিব, চোখের উপর মুখখানি ভাসিতে থাকিবে, প্রাণটা এমনি করে পূর্ণ করিয়া, বিচ্ছেদ নাই, বিড়ম্বনা নাই, মৃত্যু নাই, অন্ধকার নাই, কেবল জ্যোতি, কেবল বাতাস, কেবল উচ্ছ্বাস, কেবল আনন্দ! দুর্ব্বল ব্রাহ্মণ-শিশু সবল বৎসতর ধরিয়া রাখিতে না পারিয়া কাঁদিয়া গগন ফাটায় "আহা তুমি যদি আমার মত মরা হইতে।"

প্রাণের প্রাণত্ব এইখানে, জীবনের জীবনত্ব এইখানে, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব এইখানে, ক্ষীণকায় শুষ্কমস্তিষ্ক পীড়িত জনে পরকাল নাই বলিয়া সুস্থ হয়, এ দৌড় তাহারা আর সহিতে

পারে না। অনন্ত জীবন স্মরণ করিতে, আত্মার অমরত্ব কল্পনা করিতে তাহারা ভীত হয়। অমরত্ব না থাকিলে, উঃ কল্পনায়ও গা শিহরিয়া উঠে।

তুমি আমি ছাড়াছাড়ি হইব, সাঁঝের তারা দুটীর মত অনন্তগগনে পর্য্যটন করিব না, অনন্তবিশ্বে ঘুরিব না, "আলস যমুনা বহই যায়" দেখিব না, সায়াহ্নের রাঙ্গা পায় প্রকৃতি লুটাইয়া পড়িতেছে দেখিব না, ফুলগুলি ফুটিবে, ফুলগুলি ঝরিবে দেখিব না, পাখী গান গাইতে গাইতে উড়িয়া পলাইবে দেখিব না, আর তোমার সেই মুখ খানি—ঈশ্বর আমার কল্পনা নিবারণ করুন।

না ভাই! এ সুখের সংসারে ফুলের বনে তোমার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিও না। জগৎ সুখের, সাহারাও নহে, শ্মশানও নহে। দুঃখের হইলে কি জীব এতদিন থাকিত, কেহ বংশ বৃদ্ধি করিত, জন্মিলেও কেহ বাঁচিত? তুমি দুর্ভাগ্যও নহ। এ সুখের সাগরের পাড়ে বসিয়া থাক, দুই চারিটা সুখের ঢেউ তোমার গায়েও লাগিবে। বিকৃত চক্ষে গোপালের শয্যাকে তুষানল বলিয়া কল্পনা করিও না, হিমগিরিতে অনল-কণার সম্ভাবনা নাই। এস ঐ বাঁশী বাজিতেছে, আমার সঙ্গে নাচিতে এস।